বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

B-CORE-309

বাংলা প্রবন্ধ

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. তুষার পটুয়া — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. লায়েক আলি খান — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শ্রাবন্তী পান — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

B-CORE-309

বাংলা প্রবন্ধ

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক–১ : রামমোহন রায় — সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ

একক–২ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা

একক–৩ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — আধুনিক কাব্য

একক–৪ : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — নিয়মের রাজত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক–৫ : প্রমথ চৌধুরী — সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা

একক–৬ : অন্নদাশঙ্কর রায় — জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

একক–৭ : বুদ্ধদেব বসু — রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক

একক–৮ : আবু সয়ীদ আইয়ুব — ভূমিকা : আধুনিক বাংলা কবিতা

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—স্বামী বিবেকানন্দ

একক–৯ : প্রাচ্য পাশ্চাত্যের প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ এবং ধর্ম-মোক্ষ

একক–১০ : বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্বধর্ম-জাতিধর্ম, শরীর ও জাতিতত্ত্ব এবং পোশাক-ফ্যাশন

একক–১১ : বিবেকানন্দের ভাবনায় পরিচ্ছন্নতা, আহার-পানীয় ও বেশভূষা

একক–১২ : বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতিনীতি

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ সংস্কৃতির রূপান্তর (নির্বাচিত ভাগ)—গোপাল হালদার

একক–১৩ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়

একক–১৪ : বিশ্ব বিপ্লব ও বিশ্বশান্তি

একক–১৫ : মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

একক–১৬ : সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

সূচিপত্র

B-CORE-309

বাংলা প্রবন্ধ

B-CORE 309	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১.	রামমোহন রায় — সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১-৫
	২.	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা	ড. লায়েক আলি খান	৬-১২
	৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — আধুনিক কাব্য	অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী	১৩-২৫
	৪.	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — নিয়মের রাজত্ব	ড. শ্রাবন্তী পান	২৬-৩২
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫.	প্রমথ চৌধুরী — সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৩৩-৩৮
	৬.	অন্নদাশঙ্কর রায় — জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী	৩৯-৪৬
	৭.	বুদ্ধদেব বসু — রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	৪৭-৫২
	৮.	আবু সয়ীদ আইয়ুব — ভূমিকা : আধুনিক বাংলা কবিতা	ড. তুষার পটুয়া	৫৩-৫৯
পর্যায় গ্রন্থ : ৩ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-–স্বামী বিবেকানন্দ	৯.	প্রাচ্য পাশ্চাত্যের প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ এবং ধর্ম-মোক্ষ	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৬০-৬৭
	১০.	বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্বধর্ম-জাতিধর্ম, শরীর ও জাতিতত্ত্ব এবং পোশাক-ফ্যাশন	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৬৮-৭৪
	১১.	বিবেকানন্দের ভাবনায় পরিচ্ছন্নতা, আহার-পানীয় ও বেশভূষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৭৫-৮৪
	১২.	বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতিনীতি	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৮৫-৮৭
পর্যায় গ্রন্থ : ৪ সংস্কৃতির রূপান্তর (নির্বাচিত ভাগ)— গোপাল হালদার	১৩.	সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়	অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক	৮৮-৯৩
	১৪.	বিশ্ব বিপ্লব ও বিশ্বশান্তি	অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক	৯৪-৯৭
	১৫.	মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা	অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক	৯৮-১০৯
	১৬.	সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ	অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক	১১০-১২০

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ১

সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ

রাজা রামমোহন রায়

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.১.১.১ : ভূমিকা

৩০৯.১.১.২ : প্রবন্ধের বিশ্লেষণ

৩০৯.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.১.১.১ : ভূমিকা

ভারত ইতিহাসের আধুনিক পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। তিনি ১৭৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণ হয় ১৮৩৩ সালে। তিনি সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও গতানুগতিকতাকে শাণিত যুক্তি এবং বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করেছেন। রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদের সমর্থক। তিনি সংস্কৃত, ফারসি, আরবি, ইংরেজিসহ একাধিক ভাষা ভালোভাবে জানতেন। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের সুগঠিত রূপদান করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ প্রভৃতির অনুবাদ করেন। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' এই দুটি গ্রন্থও অনুবাদ করেন। তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে একটি সংবাদপত্র পরিচালনা করেছেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছেন। সতীদাহ প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করে সহমরণ বিষয়ক 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। বাংলার নবজাগরণে রামমোহন ছিলেন এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব।

৩০৯.১.১.২ : প্রবন্ধের বিশ্লেষণ

এক.

এখানে আমাদের আলোচ্য রাজা রামমোহন রায়ের লেখা 'সহমরণ বিষক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রবন্ধটি। আমরা যদি নারী শিক্ষা ও নারী চেতনার দিকে নজর দিই তাহলে দেখব রামমোহনই প্রথম

নারীদের নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করেছেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে কমল কুমার মজুমদার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সহমরণ প্রথার ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছেন। আধুনিককালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মনের মানুষ' উপন্যাসে সহমরণ প্রথার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলেছেন। ঠিক এইরকমভাবে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, পণপ্রথা-কৌলীন্যপ্রথা-বাল্যবিবাহ রদ ইত্যাদি বিষয়ে তৎকালীন লেখকদের এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও সমাজে নারীদের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সম্বাদ' প্রবন্ধে প্রবর্ত্তক বলতে আমরা বুঝি যে বা যিনি প্রবর্তনকারী বা প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ সহমরণ বিষয়ে যার সায় আছে। যে বা যিনি শাস্ত্রের দোহায় দিয়ে সহমরণ প্রথাকে সমর্থন করছে। আর নিবর্ত্তক বলতে বুঝি নিবারণকারী। যে বা যিনি সতীদাহের মতো এই কুপ্রথাকে নিবারণ করার জন্যে প্রবর্তকের যুক্তিকে খণ্ডনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

দুই.

রামমোহন প্রবন্ধটি শুরু করেছেন 'ওঁ তৎসৎ'দিয়ে। সহমরণ ও অনুমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শাস্ত্রের উল্লেখ করে বিচার বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।আমরা জানি, সহমরণ প্রথাটি স্ত্রীজীবনের অভিশাপস্বরূপ। এই প্রথাটি নিবারণের উদ্দেশে রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। ফলস্বরূপ এই প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্যে দিয়ে তিনি এই কাজটি করেছেন। প্রবর্ত্তক সহমরণের পক্ষে দাঁড়িয়ে যুক্তি দিয়েছেন, অন্যদিকে নিবর্ত্তক সহমরণ যে শাস্ত্রসম্মত নয় তা শাস্ত্রের উল্লেখ দিয়ে বুঝিয়েছেন।

প্রথমেই প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তককে প্রশ্ন করেন, আমাদের দেশে সহমরণ ও অনুমরণের যে সব নিয়ম আছে তার পালিত হচ্ছে না কেন? নিবর্ত্তক যখন বলেন যে আত্মহত্যা সব শাস্ত্রে এবং সব জাতিতে নিষিদ্ধ তখন তিনি নানা শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। অঙ্গিরা মুনি এ বিষয়ে যা বলেন তার অবতারণা করেন প্রবর্ত্তক "স্বামি মরিলে পর যে স্ত্রী ঐ পতির জলন্ত চিতাতে আরোহণ করে যে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মানুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে।" এরপর তিনি ব্যাসদেব, হারীত তাঁর বচনে কী বলেছেন, বিষ্ণু ঋষির বচনে কি বলা আছে তা একে একে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেয়েছেন যে সহমরণ স্ত্রীজীবনে অবশ্য কর্তব্য। নইলে তাঁর স্বামী মৃত্যুর পরও স্ত্রী যোনী থেকে মুক্ত হন না।

অতঃপর অনুমরণ সম্পর্কে ব্রহ্মপুরাণের কথার উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে "অন্য দেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে পর সাধ্বী স্ত্রী স্নান আচমন পূর্বক পতির পাদুকাদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক।" এইভাবে অগ্নিতে প্রবেশ করলে তা আত্মহত্যা হয় না। তাই পুত্রের মৃত্যুর তিনরাত অশৌচ পূরণ হলে শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রাদ্ধ করতে পারবে।

বেদে বলা আছে মৃত পতির অনুমরণ ব্রাহ্মণী করবেন না। অন্যদিকে ইতর বর্ণের যে স্ত্রীরা আছে অনুমরণকে তাদের পরম তপস্যা বলে মনে করতে হবে। যে ব্রাহ্মণী পতি মৃত্যুতে অনুমরণে যায় তার আত্মহত্যায় পাপ হয়। সেই পাপের ভারে নিজেকে এবং পতিকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে না। এত শাস্ত্রে সিদ্ধ যে সহমরণ ও অনুমরণ, তা কখনওই শাস্ত্র নিষিদ্ধ হতে পারে না বলে তাঁর মত। এই ব্যাখ্যা শুনে নিবর্ত্তক বলেন, এইসব যা যা বললেন তা স্মৃতি বটে এবং এইসব বচন দ্বারা, এটাই জানা যাচ্ছে যে সব স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে তারা অনন্তকাল স্বর্গেবাস করে।

নিবর্ত্তক এখানে মনু স্মৃতির ব্যাখ্যা দিয়ে বিধবা ধর্ম পালনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। মনু স্মৃতিতে আছে,"পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহারা ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না। আর আহারাদি বিষ্যে নিয়ম যুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম তাহাঁর আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক থাকিবেন।।" মনু স্মৃতির বিপরীত যেসব অঙ্গীরাসহ অন্যান্য স্মৃতি গ্রাহ্য হতে পারে না। কেননা বেদে বলা আছে, যা কিছু মনু বলেছেন তাই পথ্য। এছাড়াও বৃহস্পতি বচনে বলা হয়েছে, "মনু স্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে।" সুতরাং মনুযাজ্ঞবল্ক্য নিজের ইচ্ছাতেই স্মৃতিতে বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্য ধর্মই লিখেছেন। এর জন্যই স্ত্রীলোক পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করবে।

প্রবর্ত্তক অস্বীকার করেন না, অঙ্গিরা স্মৃতি মনু স্মৃতির বিপরীত। মনু যে কর্ম করতে বিধান দেননি সেই কর্ম করতে অন্য স্মৃতিকারেরা বিধান দিলে মনুস্মৃতির বিপরীত হয় না। যেমন মনু সন্ধ্যা দিতে বিধি দিয়েছেন, হরি সংকীর্তন করতে বলেননি। কিন্তু ব্যাসদেব হরিসংকীর্তন করতে বলেছেন। এক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য মনুর বিপরীত না নিশ্চয়। মনু বিধবাকে ব্রহ্মচর্যের বিধি দিয়েছেন কিন্তু বিষ্ণুসহ অন্যান্য ঋষি ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ দুয়েরই বিধান দিয়েছেন।

নিবর্ত্তক বলেন, সন্ধ্যা ও হরিসংকীর্তন এর যে উদাহরণ তুমি দিচ্ছো তা ব্রহ্মচর্য ও সহমরণের সঙ্গে এক নয়। যেহেতু সন্ধ্যার সময় ছাড়া সন্ধ্যা দিলে হরি সংকীর্তনে বাধা হয় না আবার সন্ধ্যার পরে হরি সংকীর্তন করলে সন্ধ্যার বাধা হয় না। সুতরাং এই জায়গায় একের বিধান অন্যের বাধা কেন হবে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ বিষয়ে এক অনুষ্ঠান করলে অন্য অনুষ্ঠান করার সম্ভাবনা আর থাকে না। ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করলে সহমরণে বাধা হয়। সহমরণ করলে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মোক্ষ সাধনের বাধা ঘটে। তাই এই দুটোর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাই ওই বচন সর্বদাই মনু স্মৃতির বিপরীত। যদি মনু স্মৃতির অনুরোধে সহমরণের পক্ষে যে বাক্য অঙ্গিরা ও হারীত বচনে আছে তা যেমন মানা যায় না তেমনভাবে মনুস্মৃতিতে যে ব্রাহ্মচর্য-এর নির্দেশ আছে তাতে অঙ্গিরা ও হারীত স্মৃতির সংকোচ কেন হয় না। স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে স্ত্রী হত্যা করা উচিত নয়। বরং শ্রুতিতে আত্মহননকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

তিন.

প্রবর্ত্তক ঋকবেদের শ্রুতি করলে তখন নিবর্ত্তক বুঝিয়ে বলেন, যে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ আছে তা সহমরণে অনুমরণের প্রশংসা ও স্বর্গ লাভের লোভ দেখিয়ে করা হয়। কাঠোপনিষদের উদাহরণ দিয়ে প্রবর্ত্তক বলেছেন,"শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষ সাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয় সাধন যে কর্ম সেও পৃথক হয় ঐ জ্ঞান আর কর্ম ইহারা পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে কামনা সাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।।"

অন্যদিকে নিবর্ত্তক মুণ্ডোপনিষদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন অনেক কথা। ভাগবত গীতায় জন্ম-কর্মও তাহার ফলের কথা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, "তাবৎ বিদ্যা হইতে আধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ হয়।" এখানে এও বলা হয় যে "ভগবান মনু সর্বাপেক্ষা বেদার্থজ্ঞতা।"

১২তম অধ্যায়ে বলা আছে যে ইহলোকে ও পরলোকে নিজের বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে এই কামনাতে যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তার নাম প্রবৃত্ত কর্ম। আর কামনা পরিত্যাগ করে, ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস করে প্রতিনিয়ত যে কর্ম করা হয় তাকে নিবৃত্ত কর্ম বলে। "...সংসার হইতে নিবৃত্ত করায় যে সকল ব্যক্তির প্রবৃত্ত কর্ম্ম করে তাহারা দেবতাদের সমান হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করে আর যে ব্যক্তি কর্মের অনুষ্ঠান করে সে শরীরের কারণ যে পঞ্চ ভূত তাহা হইতে অতীত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।"

আলোচনাটি যখন এগোয় তখন সংশয়গ্রস্থ হয়ে প্রবর্ত্তক প্রশ্ন করেন যে, স্বর্গারোহণ, সহমরণ ও অন্যান্য যজ্ঞ সম্পর্কে শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে সে সকল বাক্য কি শুধু মাত্র প্রতারণা?উত্তরে নিবর্ত্তক বলেন, সে প্রতারণা নয়। গীতায় বলা আছে যে সকল ব্যক্তি ত্রিবেদোক্ত কর্ম করে এবং যজ্ঞের দ্বারা পুজো করে স্বর্গ প্রার্থনা করে সেই ব্যক্তি যজ্ঞ শেষে ভোজনের দ্বারা নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গে গমন করে। ওই সকল ব্যক্তি ওইভাবে স্বর্গ ভোগ করে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসে। কাম্য ফল লাভের আশায় ব্যক্তিরা এইভাবে কখনও স্বর্গে, কখনও মর্ত্যে বারবার যাতায়াত করে। কিন্তু মোক্ষ লাভ করতে পারেনা।

নিবর্ত্তক-প্রবর্তকের এই সংবাদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবর্ত্তক পরম্পরার কথা বললে নিবর্ত্তক উত্তর দেয় এটা ভাবা অন্যায্য। শাস্ত্রের দোহায় দিয়ে আত্মহত্যা করানো সবসময়ই অন্যায় কাজ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় চিতা আহরণ করে মৃত্যুবরণ করবে।কিন্তু মানুষেরা আগে ওই বিধবাকে মৃতপতির দেহের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। তার উপরে এত কাঠ দেওয়া হয় যাতে বিধবা উঠতে না পারে। তারপর আগুন দেওয়ার আগে দুই বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রাখা হয়। এইগুলো কোন শাস্ত্রে বলা আছে, এতো সজ্ঞানে স্ত্রীহত্যা। তখন তিনি বলেন, এইরকম বন্ধন করে দাহ করা হারীতাদির বচনে নেই ঠিকই, কিন্তু সংকল্প করার পর সহমরণ না করলে পাপ হয়। লোক নিন্দা হয়। নিবর্ত্তক প্রতিবাদ করে বলেন, যে প্রাজাপত্য ব্রত করে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। আর তাতেও যদি কেউ অসমর্থ হলে এক ধেনুমূল্য তিন কাহণ কড়ি উৎসর্গ করলেই তা সম্পূর্ণ হয়।

চার.

অনুমরণ বা সহমরণ করলে স্ত্রীর ব্যভিচারী হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই এই প্রথা উঠতে দেওয়া উচিত নয় বলে প্রবর্তকের মত।নিবর্ত্তক যুক্তি দেন, কেবলমাত্র ভাবি আশঙ্কাকে দূর করার জন্য এইরূপ স্ত্রীহত্যা পাপ জেনেও সজ্ঞানে তা করতে চান। কিন্তু ব্যভিচারের আশঙ্কা পতি বর্তমান থাকতেই হতে পারে। প্রবর্ত্তক কৈফিয়ত দেন স্বামীর বর্তমানে ও অবর্তমানের অনেক পার্থক্য আছে। স্বামী বর্তমান থাকলে স্ত্রী সব সময় স্বামীর শাসনে থাকে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে সেরকম শাসন থাকে না। নিবর্ত্তক বলেন, স্বামীর বর্তমানেও ব্যভিচারের সম্ভাবনা থাকে। কায়মন বাক্যে দুষ্কর্ম রোধ করতে শাসন একমাত্র উপায় হতে পারে না।

অতিথি সেবা দিয়ে পরস্পর ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দয়াবত্তা সর্বত্র প্রকাশ পায় একথা প্রবর্ত্তক বলেছেন। দয়া তোমাদের যে আছে তাতে নিবর্ত্তকের সংশয় নেই। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সহমরণে স্ত্রীর পরিণাম দেখে তা আমাদের সংস্কারে পরিণত হওয়ায় স্ত্রীর কাতরোক্তিতে তোমাদের দয়া হয় না। উদাহরণ দিয়ে বলেন "... শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধ কালীন কাতর তাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।।"

প্রবর্ত্তক এরপরে কোনও কিছু ভেবে না পেয়ে বলেন বিবেচনা করে দেখবেন। নিবর্ত্তক আহ্লাদিত হয়ে বলেছেন, পক্ষপাত ত্যাগ করে স্বাস্থ্য বিবেচনা করে যা শাস্ত্র সিদ্ধ হয় তাই করতে হবে। তাহলে স্ত্রী বধের পাপের জন্য দেশের অনিষ্ঠ ও তিরস্কার আর হবে না।

৩০৯.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. রাজা রামমোহন রায়ের লেখা 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'প্রবন্ধের মূলভাব বুঝিয়ে দাও।

২. 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'প্রবন্ধ অবলম্বনে রাজা রামমোহন রায়ের প্রাবন্ধিকসত্তা বিচার করো।

একক - ২

বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.১.২.১ : বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩০৯.১.২.২ : 'পত্রসূচনা' প্রবন্ধের গুরুত্ব
৩০৯.১.২.৩ : ভারতবাসীদিগের একতার উপায় : কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)
৩০৯.১.২.৪ : প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য
৩০৯.১.২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.১.২.১ : বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা গদ্যচর্চার ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এক অবিস্মরণীয় নাম। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের গ্র্যাজুয়েট। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাংলা গদ্যচর্চায় হাত দিয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগরকে তিনি গ্রহণ করতেপারেননি। তাঁর সামাজিক আন্দোলন (বিধবা বিবাহ)-এর বিরোধী ছিলেন তিনি। এবং তাঁকে 'নিছক অনুবাদক' বলে ছদ্মনামে কঠোর সমালোচনাও করেছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলীর অপকৃষ্টতা দেখাবার ইচ্ছাতেই যেন প্যারীচাঁদের গদ্যের প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন তিনি। অথচ আমাদের আনন্দ এইখানে যে, গদ্যচর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের গদ্যভাষা-শৈলী রপ্ত করেননি, করেছেন বিদ্যাসাগরী শৈলীকেই।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে, বহু কর্মব্যস্ততার মধ্যেও, বঙ্কিমচন্দ্র একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। বাঙালী জীবনের মান উন্নয়নের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যপত্রের প্রয়োজন তিনি অনেকদিন থেকেই অনুভব করে আসছিলেন। ১৮৭০-৭১-এর ইংরেজি লেখালেখিতেও এ বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি ঃ

> ''We can hardly hope for a healthy and vigorous Bengali literature in the utter absence of anything like intelligent criticism'' [Bengali literature / Calcutta Review. 1871 No.-104]

এক স্বাস্থ্যকর ও শক্তিশালী সমালোচনাকর্মের জন্য আগ্রহী বঙ্কিমচন্দ্র অবশেষে পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বহরমপুরে বসে লেখা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে পত্রিকা প্রকাশ করেন কোলকাতা থেকে। প্রকাশের ঠিকানা ঃ—ভবানীপুর, ১নং পিপুল পটি লেন। প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রী ব্রজমাধব বসু। পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন মাসিক পত্র ও সমালোচনা'। পত্রিকার প্রকাশকাল ১ বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ১২ এপ্রিল ১৮৭২। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের ফলে, বাঙালী পাঠকের হয়ে, তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এইভাবে : "পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক ভুলানো কথা — কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগত রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিক পত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

এই পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ হিসেবে মুদ্রিত হয় 'পত্র সূচনা' নামক প্রবন্ধ। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার ২০ বছর পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭ম প্রবন্ধরূপে এই রচনাটি গৃহীত হয়। এবং তখন রচনাটির শিরোনাম বদল করেন লেখক। নতুন শিরোনাম হয় 'বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা'। এই প্রবন্ধটির শিরোনামের পাশে তারকা চিহ্নিত করে, গ্রন্থে পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখতে দেখি—"এই প্রবন্ধ মুদ্রিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে তাহার পুনরুক্তি প্রয়োজনীয়। ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়।"

৩০৯.১.২.২ : 'পত্রসূচনা' প্রবন্ধের গুরুত্ব

'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের গুরুত্ব আছে। তিনি বলেছেন, বঙ্গভাষী লেখকদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁরা যত যত্ন করুন না কেন এ দেশের শিক্ষিত (নিশ্চয়ই ইংরেজি শিক্ষিত), বঙ্কিমের ভাষায় 'কৃতবিদ্য', সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁদের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরেজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাংলা ভাষায় লিখিত হতে পারেনা। তাঁদের মতে বাংলা ভাষার লেখকগণ বিদ্যাবুদ্ধিহীন। লিপিকৌশল শূন্য, না হয় তাঁদের রচনা ইংরেজির অনুবাদমাত্র, সুতরাং মূল রচনা যখন ইংরেজিতে আছে তখন বাংলায় তা পড়ে আত্মাবমাননা নিরর্থক। সংস্কৃত পণ্ডিত অভিমানীদের ভাষা (বাংলা)-র প্রতি অশ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত। আর যাঁরা বিষয়ী তাঁরা কোনো ভাষারই বই পড়েন না। তাঁদের অবকাশ নেই। সুতরাং বাংলা গ্রন্থ (ও পত্রিকা) পড়বার দায়িত্ব হল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অল্পবয়সিনী পৌরকন্যা ও কোনো কোনো নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের। কোনো কোনো কৃতবিদ্যা ব্যক্তি বাংলাগ্রন্থের বিজ্ঞাপন অথবা ভূমিকা পাঠ করে বিদ্যোৎসাহী বলে খ্যাতিলাভ করেন। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কাজ বাংলায় হয় না। বিদ্যালোচনা, সভা, লেকচার,

প্রোসিডিংস ইত্যাদি সকল কিছু ইংরেজিতে হয়। কথোপকথন ষোল আনা, কখনো বার আনা ইংরেজিতে, 'পত্রলেখা কখনোই বাংলায় হয় না'।

ইংরেজদের থেকে বাংলাদেশ উপকৃত হয়েছে। এর প্রধান কারণ হোল ইংরেজি ভাষা। ভারতের বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে ইংরেজি হবে তার প্রধান উপায়। "এত মতত্ব এক পরামর্শত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরেজী দ্বারা সাধনীয়, কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে।" কিন্তু ইংরেজি যতই অধ্যয়ন করা যাক, সমগ্র বাঙালি জাতি ইংরেজ হয়ে উঠতে পারবে না। বঙ্কিম বলেন,—"ইংরেজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র।" তাঁর মতে নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙালি স্পৃহনীয়। সুশিক্ষিত, জ্ঞানবন্ত, বাঙালি কর্তৃক বাংলা ভাষা চর্চা না হলে বাঙালীর উন্নতি সম্ভব নয়। সমগ্র বাঙালি জাতির উন্নতি না হলে দেশের কোনো মঙ্গল সাধিত হবে না। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বলেন যে, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা শিক্ষিত হলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বিদ্বান হয়ে উঠবে। শিক্ষা জলের ধারার ন্যায় নিম্নগামী হয়ে জনসাধারণের উন্নতি সাধন করবে, এই ধারণা ভ্রমাত্মক।

আসল কথা, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা নেই। শক্তিমান উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যতদিন ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তিগণের জন্য দুঃখবোধ না করে ততদিন কোনো ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণীর পক্ষে উন্নতির সম্ভাবনা নেই। সমাজের মধ্যে যদি সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকে তবে দেশের প্রভূত অনিষ্ট হয়। প্রাচীন এথেন্সে সকলের সমঅধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু স্পার্টায় এক জাতি প্রভু ও এক জাতি ছিল দাস। এথেন্সের সভতা সমগ্র ইয়োরোপকে আলোকিত করেছে, কিন্তু স্পার্টা কুলক্ষয়ে ধ্বংস হয়েছে। ভাষাভেদ পার্থক্য সৃষ্টির কারণ। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন অত্যাবশ্যক। বঙ্কিম বলেন, তিনি বঙ্গদর্শনকে সর্বজনপাঠ্য করে তোলার প্রয়াস করবেন। নব্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপামর সাধারণের সহৃদয়তা বৃদ্ধির প্রয়াস তাঁদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। ভাষার বন্ধনের সাহায্যে জাতিগত সংহতিস্থাপন, সমাজের মঙ্গলসাধন, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্যের অপসারণ; এই সকল চিন্তা ও বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। জাতিগত ঐক্য স্থাপিত না হলে যে ধ্বংস অপরিহার্য একথা প্রমাণ করতে তিনি ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করেছেন। রোম, এথেন্স, ইংলন্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। প্রাচীন ভারতবর্ষে এক সময়ে বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে এদেশের অনিষ্ট ও অমঙ্গল হয়েছে এখন বর্ণগত পার্থক্য কিছু পরিমাণে লোপ পেয়েছে বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধেও এই সমস্যার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি অনেক আগেই অনুধাবন করেছিলেন। 'পত্রসূচনা' তার প্রমাণ।

যাইহোক সামাজিক স্তরে এই যে বিভেদ, এর মূলে, বঙ্কিমের বিবেচনায়, আছে ভাষার ব্যবধান। সুশিক্ষিত বাঙালির মনোভাব যদি বাংলা ভাষায় প্রচারিত না হয় তবে সাধারণ বাঙালি তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে না। সুশিক্ষিত বাঙালি রচনার বেলায় বাংলা ভাষা গ্রহণ করতে পারে না। কেননা বঙ্কিমের আক্ষেপ 'সুশিক্ষিতে' বাংলা পড়েনা। "সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।" অন্যদিকে ভালো বাংলা বই, পত্রপত্রিকা কোথায় যে সুশিক্ষিত লোক তা পাঠ করবে? অতএব উঁচুমানের

পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন সেই প্রয়োজনেই আবির্ভুত। — একথা বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য। তিনি বলেন—"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব, এইমাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।" এরপর এই পত্রিকা প্রকাশের আরো দুটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন লেখক। (১) এই পত্রিকা কৃতবিদ্যা বাঙালীদের মুখপত্র হোক। এই পত্র কোনো বিশেষ পক্ষের বা সম্প্রদায়ের নয়। (২) যাতে নব্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপামর সাধারণের সহৃদয়তা বৃদ্ধি পায় এই পত্রিকা তার জন্য চেষ্টিত।

হয়তো এসব বাসনা সম্পূর্ণ সফল হবে না, হয়তো দীর্ঘজীবী হবে না এ প্রয়াস, তবু চেষ্টা মাত্রেরই একটি সুফল আছে। সেই ভরসায় এই পত্রিকা-সম্পাদক উপসংহারে লিখেছেন—"এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না!.... কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়ম বলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।"

৩০৯.১.২.৩ : ভারতবাসীদিগের একতার উপায় : কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)

উনিশ শতকের বিতর্কিত ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিত্ব কেশবচন্দ্র সেন। কোলকাতার কলুটোলা নিবাসী প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র। তাঁর পিতামহ রামকমল সেন হুগলী জেলার গৌরীভা গ্রাম থেকে কলুটোলায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর ১১ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। পিতামহর মৃত্যু হয়েছিল আরো ৫ বছর আগে। ফলে তাঁর অভিভাবকত্ব করেন জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন। বংশসূত্রে তাঁরা বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। হিন্দু কলেজে ৭ বছর বয়স থেকে ১০ বছর পড়াশুনা করেন তিনি। মাঝে কিছুদিন নতুন প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটনে ভর্তি হলেও আবার হিন্দু কলেজে ফিরে আসেন। কিন্তু পরীক্ষা চলাকালে কোনো অপরাধে তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয় ও আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। এর ফলে তিনি গভীর মানসিক আঘাত পান এবং অধ্যাত্ম ভাবনার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে যুবক কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ১৮৫৭ সালের দিকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। সুবক্তা, মেধাবী ও কর্মোদ্যোগী কেশবচন্দ্রকে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথেরও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কেশবচন্দ্রের নতুন নতুন উদ্যোগ ও প্রক্রিয়া ব্রাহ্মধর্মের পুরাতনপন্থীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। ১৮৬৬-র শেষ দিকে (১১ নভেম্বর) কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবেন্দ্রনাথদের ব্রাহ্মগোষ্ঠী 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হয়। নতুন ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের সংস্কার পন্থা ও বৈষ্ণবীয় নামকীর্তন প্রক্রিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক নিন্দিত হতে থাকে। এই সব কাজে বক্তৃতায় পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয় বহুমূত্র রোগে, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি। "কেশবচন্দ্রের অসামান্য মনীষা মুখ্যতঃ দেশের ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারগত প্রয়োজনেই নিযুক্ত হইয়া ছিল। বাগ্মিতা, সংবাদপত্র

পরিচালনা ও ধর্মোপদেশাশ্রিত রচনা তাঁহার লোকোত্তর প্রজ্ঞার সার্থক নিদর্শন। কেশবচন্দ্র প্রধানত ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁহার নিত্যনূতন ধর্মীয় চিন্তাধারা বিবিধ ধর্মমূলক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং বাংলা ভাষায় কেশবচন্দ্র যে অভিনব ভঙ্গি ও বাক্যগ্রন্থনের সরল কৌশল প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক রূপও উন্মোচিত হইয়াছে। বঙ্কিমপর্বে কেশবচন্দ্রের এই স্বতন্ত্র সাহিত্যিক সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবার নহে।" [অধীর দে /আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (১ম), পৃষ্ঠা-১৮৭] একটা ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে অন্য গদ্যকারের পার্থক্য আছে। তাঁর কোনো বাংলা রচনাই তিনি নিজে লেখেননি। তাঁর সমস্ত বক্তৃতা বা ধর্ম উপদেশ তাঁর অনুগত শিষ্যরাই অনুলিখন করেছেন। এবং পরে কেশবচন্দ্র সেগুলি সংশোধন ও পরিমার্জন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থকারের রচনার ভাবপ্রবাহ ও স্বতস্ফূর্ততা এর মধ্যে কিছু পরিমাণে হলেও ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ।

কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল—

১। সেবকের নিবেদ ন (১৮৮০), ২। জীবনবেদ (১৮৮৪), ৩। দৈনিক প্রার্থনা (১৮৮৪-৮৫), ৪। ব্রহ্ম গীতোপনিষৎ (১৮৮৬, ৯৩), ৫। ব্রাহ্মিদিগের প্রতি উপদেশ (১৮৮৭), ৬। সাধু সমাগম (১৮৮৭), ৭। মাঘোৎসব (১৮৮৮), ৮। ব্রহ্মোপসনা (১৯০১), ৯। প্রতিমা (১৯১২), ১০। দৈনিক উপাসনা (১৯১৬), ১১। আচার্য্যের উপদেশ (১৯১৬-১৮), ১২। সঙ্গত (১ম-১৯১৬, ২য়-১৯৩৮)।

কেশবচন্দ্রের অনেকগুলি রচনাই তাঁর বক্তৃতার বহু দিন পরে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা গ্রন্থিত। কেশবচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই ধর্মবিষয়ক। তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর সব বক্তৃতায় যুক্ত করে দিয়েছেন। তা সে সব বক্তৃতা শিক্ষা, সমাজ বা অন্য যে কোনো বিষয় নিয়েই হোক না কেন। 'জীবনবেদ' কেশবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। ধর্মসাধক কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনাশ্রিত এই গ্রন্থে তাঁর আধ্যাত্ম জীবনের প্রসঙ্গ থাকলেও এখানে 'মানুষ' কেশবচন্দ্রের পরিচয় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়নি। মানুষ কেশবচন্দ্র যে ক্রমান্বয়ে সাধক পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন—এ কথার বর্ণনায় 'জীবনবেদ' অধিক আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কেশবচন্দ্রের কিছু পত্র আছে যা মহৎভাব ও সমৃদ্ধ ভাষার ব্যবহারে সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে গদ্যকার কেশবচন্দ্রের অনন্যতার স্মারক হয়ে আছে। বিশেষ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর পত্রগুলি এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে।

৩০৯.১.২.৪ : প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য

'ভারতবাসীদিগের একতার উপায়' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় সুলভ সমাচারে ৫ চৈত্র, ১২৮০ সালে। যথেষ্ট বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী মানসিকতায় রচিত এই প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের মৌলিক একটি সমস্যার সমাধানসূত্র অনুসন্ধান করেছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূলে আছে এই দেশের অনৈক্য। এই অনৈক্যের সমাধান না হলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এজন্য ভারতবর্ষের অনৈক্যের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন কেশবচন্দ্র।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের ঐক্য অসম্ভব। এবিষয়ে কেশবচন্দ্র আর কোনো মন্তব্য করেননি। তাঁর বক্তব্য, পক্ষান্তরে যখন আর্যরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন তাঁদের মধ্যে এক্য ছিল। এখন সেই ঐক্য নেই কেন? কেশবচন্দ্র এজন্য দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন— ১. ভাষা। যতদিন সমগ্র

ভারতবর্ষে এক ভাষা না হবে ততদিন কিছুতে একতা সম্পন্ন হবে না। যতদিন আর্যদের একমাত্র সংস্কৃত মাতৃভাষা ছিল ততদিন অনৈক্য ছিল না। কালক্রমে আর্যরা আদিম ভারতবাসীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বর্ণসঙ্কর হলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং সমগ্র ভারতবর্ষে আর্যরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন আর্যদের ভাষা ও আদিম অধিবাসীদের ভাষা মিশ্রিত হয়ে অনেক বিকৃত ভাষা দেখা দিল এবং ভাষাভেদে দলভেদের উৎপত্তি হল। নিজের ভাষাকে উৎকৃষ্ট মনে করে অন্যের ভাষাকে নিকৃষ্ট ভাবার চেষ্টায় জাতি ও সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ দেখা দিল। এখন ভারতবর্ষে অনেক ভাষা প্রচলিত—এর মধ্যে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, উৎকল, পাঞ্জাবী, দ্রাবিড়, কর্ণাটি, মহারাষ্ট্রি, তৈলঙ্গী — প্রধান। সংস্কৃত এখন মৃতপ্রায় ভাষা। এখন প্রদেশে প্রদেশে ভাষা সূত্রে বিরোধ। সমস্ত বঙ্গদেশে এক বাংলা ভাষা প্রচলিত হলেও কোলকাতার বাংলা ভাষা ও পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বাংলা ভাষার মধ্যে একতা নেই—"কলিকাতা অঞ্চলের লোকেরা পূর্ব বাঙ্গালার লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালদিগকে মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। আবার পূর্ববঙ্গের লোকেরা শ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রামের লোকেদেরও বাঙ্গাল বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোকেদের মধ্যেও বেশ কিছু ভালো লোক আছেন। তাঁদের অনেক আচার-আচরণ কোলকাতার লোকদের থেকেও ভালো। অথচ তাঁদের মধ্যে বিরোধের একমাত্র কারণ ভাষা তথা উচ্চারণের দূরত্ব।"

ভাষার একতা ছাড়া যদি ভারতবর্ষে একতা না আসে তা হলে সারা ভারতের জন্য কোনো এক ভাষার সন্ধান করা যায় না কি? এজন্য লেখকের পরামর্শ, সারা ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ভাষা হিন্দী। এই হিন্দী ভাষাকে যদি ভারতবর্ষে একমাত্র ভাষা করা যায়—তাহলে এই সমস্যা মিটতে পারে। তবে এ ব্যাপারে রাজশক্তি ইংরেজের সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার। তবে ইংরেজ সরকার তা চায় না। কারণ বিজিত জাতির মধ্যে একতা বিজয়ী ইংরেজের ভয়ের কারণ হতে পারে। তাই একাজ দেশীয় বড়ো বড়ো রাজারা করতে পারেন। এ ব্যাপারে ইংরেজদের ভয়ও অমুলক। কেননা কোনো দেশে একটি ভাষার একতা থাকলে সে দেশ অপরাজেয় হয় না, তা হলে ফরাসীরা জার্মানীর দ্বারা পরাজিত হয় কেন?

কেবল ভাষা-ঐক্য নয়, উচ্চারণের ঐক্যও দরকার। এজন্য এক ভাষাভাষী মানুষদেরও সুশিক্ষিত হতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় ধর্ম। যেমন ভাষা এক না হলে একতা হতে পারে না, তেমনি ধর্ম এক না হলে কোনো কালে একতা হতে পারে না। আমাদের এদেশে মুসলমান এরূপ প্রভেদ তো আছেই, অন্যদিকে হিন্দুদের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদে অনৈক্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। একে কিভাবে অতিক্রম করা যায়? কেশবচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবে এবারে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার প্রসঙ্গে চলে আসেন। তিনি বলেন—"আর্য জাতির চিরপূজ্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইলে সর্বপ্রকার অনৈক্য চলিয়া যাইবে।" এক ভাষা ও এক ধর্ম প্রচলিত হলে ভারতবর্ষের সবরকমের অনৈক্য অপসৃত হবে।

সমাজ রাজনীতির বিচিত্র জটিল ছককে ধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র অনেকটা ধরতে পারলেও সমগ্রটা উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি কেবল তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছেন। এক ভাষা এক ধর্ম প্রচলিত হলেই যে জাতীয় ঐক্য প্রচলিত হয় না তার প্রমাণ পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রমুখ রাষ্ট্র বরং জাতীয় ভাব গড়ে তোলার জন্য যে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সাম্যবিধানেই যে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে বিশ শতকে গড়ে ওঠা সোভিয়েত দেশ তার প্রমাণ এবং সোভিয়েতের বিনষ্টির কারণও পূর্বোক্ত সূত্রের ওপর নির্ভরশীল।

৩০৯.১.২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা দেশের কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে চেয়েছে এবং কিভাবে? –আলোচনা করো।

২। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নব্য লেখকদের প্রতি যে আহ্বানগুলি রেখেছেন, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৩। 'ভারতবাসীদিগের একতার উপায়' প্রবন্ধে লেখক ভারতবাসীদের একতার যে যে উপায় সন্ধান করেছেন তার উল্লেখ করো এবং ঐ বক্তব্য কতটা সমর্থনযোগ্য বলে তুমি মনে করো তা বুঝিয়ে দাও।

৪। 'বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা' প্রবন্ধটির প্রকাশকাল কত? প্রকাশকালে রচনাটির নাম কি ছিল?

৫। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য–লেখকের অনুসরণে বুঝিয়ে দাও।

৬। আমাদের দেশের জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের ধারণা কী ছিল?

৭। ভাষা ও ধর্মের ঐক্য বলতে কেশবচন্দ্র কী বলতে চেয়েছেন?

৮। ভারতের জাতীয় ঐক্য প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের যুক্তিগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য–আলোচনা করো।

একক - ৩

আধুনিক কাব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.১.৩.১ : ভূমিকা

৩০৯.১.৩.২ : প্রবন্ধের বিশ্লেষণ

৩০৯.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.১.৩.১ : ভূমিকা

'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধ 'আধুনিক কাব্য'। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী তাঁকে অনুরোধ করেন 'মর্ডান বিলিতি কবিদের' নিয়ে কিছু লিখতে। পত্রিকার তাগিদে কলম ধরলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাতে যে সৃষ্টিটি হল সেটি 'আধুনিক' শব্দটির বিচারের ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হয়ে থাকল। অর্থাৎ পরবর্তীকালে যাঁরা আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁরা 'আধুনিক' শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণে এই প্রবন্ধটির কথা অবশ্যই ভেবেছেন। এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামতকে অজস্র উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। এতটা বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ কমই লিখেছেন একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবেনা। বিলেতে সমালোচকরা সময়কাল ধরে আধুনিকতা নির্ণয়ের যে প্রবণতা তৈরি করেছিলেন তা বাংলার সাহিত্যিক ও সমালোচকরাও খানিকটা মানতে শুরু করেছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' নামক গ্রন্থেও তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবণতাকে মানতে পারেননি, সেই প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

৩০৯.১.৩.২ : প্রবন্ধের বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য রয়েছে যা পরবর্তীতে বহুজনই উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখছেন,--"পাঁজি মিলিয়ে মডার্নর সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের

কথা।" একথা অত্যন্ত ঠিক। এই একবিংশ শতাব্দীতে বসে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মানুষকে বলে দিই পুরনো দিনের মানুষ। কিন্তু ভেবে দেখিনা সেযুগের মানুষ ছিলেন যে রামমোহন, যে বিদ্যাসাগর তাঁরা মনে, প্রাণে, চিন্তা চেতনায় কতটা আধুনিক ছিলেন। তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন বলেই কি আমরা তাঁদের 'পুরাতন' বলে দেগে দিতে পারি? আর যাঁরা আমাদের সময়ে সাপে কামড়ালে ওঝার কাছে দৌড়চ্ছেন, সমস্যার সমাধানের জন্য নির্ভর করছেন তান্ত্রিকের ওপর, যে তান্ত্রিক সিদ্ধিলাভের জন্য নরবলি দিচ্ছে আজও, তারা শুধু এযুগে জন্মেছে বলেই আধুনিক! এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই ভেবেছিলেন কাল ভোর থেকে আধুনিক যুগ শুরু হবে এমনটি যেমন বলা যায় না, তেমনি কোন বিশেষ কালের পরিপ্রেক্ষিতে কোন মানুষ বা কোন সাহিত্যসৃষ্টিকে 'আধুনিক' বলে দেওয়া যায়না। আসলে সেটি নির্ভর করে মানসিকতার ওপর, প্রকাশভঙ্গীর ওপর। তাই তাঁর মন্তব্য"এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" জীবন কখনো সমান পথে চলে না, তার গতি নদীর মতো আকা-বাঁকা, ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তার চলন। জীবনের দর্পণ সাহিত্যও তাই—তার চলনও নদীর মতো। কখন সে বাঁক ফিরবে কেউ জানেনা। যখন যখন সে বাঁক ফিরবে তখনি বুঝতে হবে সেখানে কিছু নতুনত্বের সঞ্চার হয়েছে বলেই পরবর্তী সময়ে এসে মানুষ দেখতে পেয়েছে ঐ সময় থেকে সে নতুন খাতে বয়েছে। কিন্তু 'ঐ সময়' টা সবসময়ই হতে পারে, সেটা কেউ তারিখ মিলিয়ে নির্ধারণ করে দিতে পারেনা। আসলে যুগের গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে প্রগতিশীল ভাবনার পরিচয় যখনি যখনি কোনো সাহিত্যে বা যেকোন সৃজনকর্মে দেখা গিয়েছে বা দেখা যাবে তখনি সেটি হয়ে উঠবে 'আধুনিক'।

মর্ডান বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকিয়েছেন। তিনি শুরু করেছেন সেই সময়টা দিয়ে যখন ইংরেজী সাহিত্যে 'রোমান্টিক যুগের' সূচনা হয়েছে। তিনি লিখেছেন "বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, বি বার্নস থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন যথা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্স।" এই যে যুগের কথা এখানে উঠে এল সে যুগটির সঙ্গে একটু পরিচিত হওয়া যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যসম্ভারকে স্পষ্টই দুভাবে ভাগ করা যায়। আমরা যে যুগটির কথা বলছি সেটি হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এই যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে ক্লাসিকাল যুগের নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, বাঁধা গতে চলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এর আগে পর্যন্ত সাহিত্য হয়ে উঠেছিল বড়ো বেশি নগরকেন্দ্রিক। দমবন্ধ করা, ইঁট কাঠ পাথরে গড়া নগরজীবনের ছবি আঁকতে আঁকতে সাহিত্যিকরাও যেন হয়ে পড়েছিলেন ক্লান্ত, বিবর্ণ। একঘেয়েমি কৃত্রিমতা তাঁদেরকে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিতে পরিণত করেছিল। এমন সময়ে রুশো তার রচনায় শোনালেন উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির কাছে ফিরবার আহ্বান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সব কিছুই ছিল গণ্ডীবদ্ধ, পরিমিত, যুক্তি ও বিচারের চাপে মনের কল্পনার বিস্তার ছিল সীমায় আবদ্ধ। এত নীতি, নিয়ম মানতে মানতে মানুষ কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। এবার স্বাধীনভাবে কল্পনার জগতে সীমাহীন উড্ডীনের দিন এল। শুরু হল

এক নতুন অধ্যায়, যা চিহ্নিত হল রোমান্টিসিজিম নামে। নিয়ম অনুশাসনের কারবার থেকে মুক্ত কবি-সাহিত্যিক স্বেচ্ছায় কল্পনার ডানা মেলে দিলেন দিক- বিদিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলেকজান্ডার পোপ থেকে অন্যান্য যে সাহিত্যিকরা শাসন করেছিলেন ইংরেজী সাহিত্যকে তাঁরা মূলত চর্চা করেছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে। লর্ড বা লেডিদের একটু হাসি, খুব সাধারণ গতানুগতিক কাজকর্মও হয়ে উঠেছিল সাহিত্যের সামগ্রী। কিন্তু রোমান্টিক কবিরা সেইখান থেকে সরে এসে আসন বেছালেন একেবারে সাধারণ মানুষের আঙিনায়, তাদের হাসি-কান্নায় ভরে উঠল সাহিত্যের প্রাঙ্গণ। এই পথে চলাকে সেযুগের বিচারে অবশ্যই আধুনিক মনে হল।

লণ্ডনের অতি পরিচিত ইঁট-কাঠ পাথরের পরিবেশে কবিত্বের উপকরণ না খুঁজে পেয়ে কবিরা ছুটলেন অজানার দিকে সেখানে অস্পষ্টতা, রহস্যময়তার কুহেলি কবিতায় দিল অন্য মাত্রা। যুক্তির প্রখর আলোয় সবকিছুই ছিল বড়ো প্রত্যক্ষ বড়ো স্পষ্ট। রোমান্টিক কবি রচনা করলেন এক বিস্ময়াবিষ্ট ভুবন। মধ্যযুগের ইতিহাস, রূপকথা ফিরে এল কবিতায়। ঐতিহাসিক পটভূমিতে রোমান্স এক অপূর্ব রূপ নিল। স্কটল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড কিংবা ওয়েলসের কেল্ট জাতির মধ্যে যে রূপকথা ছিল তা বড়ো জায়গা নিল কবিতায়। মানুষ একদিকে বুঝল সে অতীত সংস্কৃতির ধারক-বাহক এবং অন্যদিকে প্রকৃতির অনাবিল বিস্তৃতি হয়ে উঠল তার সাহিত্যের ক্যানভাস। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, নিজস্ব চেতনার রঙে রঙীন হয়ে উঠল কাব্যজগত। আত্মমগ্ন গীতিকবিতা ডানা মেলল আপন ছন্দে। এলিজাবেথীয় যুগে একবার এই রোমান্টিকতার দেখা মিলেছিল, সে ছিল নবলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রথম বহির্প্রকাশের আনন্দে উচ্ছ্বল। আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রোমান্টিকতা আনন্দে-বিষাদে মাখামাখি হয়ে খুলে দিল এক অনন্য অনুভূতির দরজা, পুরনোকে ফিরে পাওয়া গেল নতুনরূপে। ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি এই রোমান্টিকতাকে কেউ বললেন Romantic Revival, কেউ বললেন Romantic Reaction. তবে যাই হোক, প্রচলিত ধারায় যে নতুনত্ব এল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই এবং তাই তখন হয়ে উঠল আধুনিক।

রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের শুরুতে রাখলেন বার্নস (১৭৫৯-১৭৯৬) কে। তাঁর আগে থেকেই অবশ্য রোম্যান্টিক যুগের সূচনা অল্প বিস্তার হয়ে গেছে জেমস টমসন (১৭০০-১৭৪৮), জন ডায়ার (১৬৯৯-১৭৫৭), এডওয়ার্ড ইয়ং (১৬৮৩-১৭৬৫), রবার্ট ব্লেয়ার, উইলিয়াম কলিন্স (১৭২১-১৭৫৯), উইলিয়াম সেন্‌ষ্টোন (১৭১৪-১৭৬৩), জোসেফ ওয়াটন (১৭২২-১৮০০), টমাস গ্রে (১৭১৬-১৭৭১), জেম্‌স ম্যাকফারসন (১৭৩৬-১৭৯৬), টমাস চ্যাটারটন (১৭৫২-১৭৭০), উইলিয়াম কুপার (১৭৩১-১৮০০) প্রমুখের কলমে। বার্নস ছিলেন স্কটল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি, গীতিকবি। কৃষকের সন্তান বার্নস খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাব্যে জায়গা দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে। মনেপ্রাণে বিশ্বনাগরিক বার্নস ছিলেন স্কটল্যান্ডের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁর কাব্যে শোনা গেছে চিরদিনের মানবতার জয়গান। এমার্সন বলেছিলেন,--"স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী এবং মার্সাইর স্বাধীনতার সঙ্গীতের চেয়ে বার্নস এর সঙ্গীতে মানুষের স্বাধীনতার সুর অনেক স্পষ্টভাবে ধ্বনিত।" তাঁর গীতিকবিতার মধ্যে রয়েছে,—'A fond kiss', 'O west thou in the cold

Blast', 'Green grew the Rashes', 'My love is like a red rose', 'To see her is to love her', 'Highland Mary', 'Mary Morrison', ইত্যাদি। মানবতার জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে যে কবিতাগুলির মধ্যে তারমধ্যে উল্লেখ্য,— 'Man's a Man for A 'That', 'Jolly Beggars', 'Scots wha Hae', 'To a Louse' ইত্যাদি।

এরপর রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, এই Romantic Revival যুগের চারজন স্তম্ভের নাম। তাঁরা হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোল্‌রিজ, শেলি, কীটস। এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) কাম্বারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছোটবেলা কেটেছে সহজ সরল গ্রাম্য প্রকৃতির মাঝে কৃষকদের সাথে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়ই তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রীর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ও পড়াশোনা শেষ করে চলে যান ফ্রান্সে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবকে নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন ছিল তা ভঙ্গ হয়ে গেল এবং তিনি স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা নিয়ে ফিরে এলেন দেশে। এই ফেরা তাঁর জন্য খুবই সুফলদায়ক হল। বন্ধু কোল্‌রিজ এবং ভগিনী ডরোথির সাহচর্য এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য তাঁকে জীবনকে দেখার এক অন্য দৃষ্টি দিল। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে বন্ধু কোলরিজের সাথে একযোগে প্রকাশ করলেন The Lyrical Ballads. এই গ্রন্থের প্রকাশ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এক মাইলস্টোন হয়ে আছে। এরপর থেকেই প্রকৃত রোমান্টিক যুগের সূচনা হয়েছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ রুশোর মতোই শুনেছিলেন প্রকৃতির আহ্বান। প্রকৃতিকে কখনো তিনি ভালবেসেছেন বালকের বিস্ময় নিয়ে, কখনো ভালবেসেছেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আবার কখনো প্রকৃতির মাঝেই তিনি অনুভব করেছেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর-প্রকৃতি-মানুষ একই সূত্রে গাথা হয়েছে তাঁর কলমে। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে,—'The lyrical Ballads', 'The Prelude', 'The Recluse', 'The Excurtion', 'Lines Written a few Miles above Tintern Abbey', 'An Evening walk', 'Laodamia', 'To a skylark', 'We are Seven', 'The Solitary Reaper', 'Resolution and Independence' ইত্যাদি।

কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪) খুব অল্প বয়সেই পিতাকে হারান এবং লণ্ডনে কাকার কাছে মানুষ হন। ছোট থেকেই দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ক্রাইস্টস হসপিটালে পড়াশোনা করার সময় দুবেলা খাবার জুটতোনা। কিন্তু ছোট থেকেই কল্পনাপ্রবণ কোলরিজের এই মনটা দারিদ্রের চাপেও কখনো কল্পনা করা থেকে সরে আসেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর সাথে আলাপ হয় বিখ্যাত কবি সাদে-র (Southey) সাথে এবং অতঃপর ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে। এই পরিচয়ের ফল The Lyrical Ballads (১৭৯৮) আমরা জানি। তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের জগৎ ছিল আলাদা। কোলরিজের কল্পনার জগৎ ছিল অলৌকিক এবং অতিবাস্তব। এক স্বপ্নিল রহস্যময়তা, আধো আলো আধো অন্ধকার জড়িয়ে আছে সেই স্বপনের জগতকে। মধ্যযুগের রহস্যময় আবহাওয়াকে কোলরিজ ফিরিয়ে আনলেন তাঁর সুরেলা, অতিলৌকিক চিত্রময় কাব্যভুবনে। সেখানে প্রকৃতি আছে কিন্তু তা অবস্থান করছে অতিপ্রাকৃতের

সাথে মিলে মিশে গিয়ে। তাঁর বিখ্যাত তিনটি কবিতা Kubla Khan, The Ancient Mariner G Christable—এ স্বপ্ন ও অতিপ্রাকৃত মিশে রয়েছে। অতিপ্রাকৃতের পাশাপাশি প্রকৃতিও তাঁর কাব্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। Kubla Khan কবিতাটি স্বপ্নে পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর অন্যান্য বহু পরিচিত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে The Eolian Harp, Frost at Midnight, Dejection, An Ode, Ode on the Departing year, France, An ode ইত্যাদি। কোলরিজ কবিতা লেখার পাশাপাশি সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও রেখে গেছেন কৃতিত্বের পরিচয়।

Percy Bysshe Shelley (১৭৯২-১৮২২) জন্মগ্রহণ করেন ইংল্যাণ্ডের অভিজাত পরিবারে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি নাস্তিক্যবাদের প্রচার করতে থাকেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হন। তবে তাঁর নাস্তিক্যবাদ ছিল ইংল্যাণ্ডে সেইযুগে প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ। প্লেটোর আদর্শে প্রাণিত শেলী বিশ্বাস করতেন এই বিশ্বের অন্তরালে রয়েছে এক মহান স্রষ্টা। বহু সমালোচকই শেলীকে মনে করেন রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। তাঁর কবিতার জগৎ ছিল সৌন্দর্য ও কল্পনার আধার, স্রষ্টা শুধু প্রেমময় নয়, তিনি সৌন্দর্যেরও প্রতীক। গ্রীক পুরাণে যেমন প্রকৃতিকে জীবন্ত বলে মনে করা হত শেলীও তেমনি প্রকৃতিকে জীবন্ত মনে করতেন। এই ক্ষমতা Myth making নামে পরিচিত। প্রকৃতি শেলীর কবিতায় চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসা প্রতিষ্ঠান বা সমাজের অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে তিনি চাইতেন মানুষকে উদার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার দিতে। তিনি ছিলেন একাধারে আদর্শবাদী ও আশাবাদী। তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল যন্ত্রণাময় তাই তাঁর কবিতার মধ্যে একটা অন্তর্লীন বিষাদের সুর সবসময়ই শোনা গেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে রয়েছে Queen Mab, Hymn to Intellectual Beauty, Alastor or the Spirit of Solitude, Prometheus Unbound, The Witch of Atlas, The Masque of Anarchy, Epipsychidion, To a Skylark, The Cloud, To Night, The Triumph of life, Julian and Maddalo, Rosalind and Helen ইত্যাদি।

এই পর্বের শেষে বলব John Keats (১৭৯৫-১৮৯১) এর কথা। অল্পবয়সে পিতা মাতাকে হারিয়ে তিনি অপরিসীম দারিদ্রের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাঁর লেখা পড়াও বেশীদূর হয়নি। তাঁর জীবনে ক্রমশই বাসা বেধেছিল শূন্যতা। হতাশা থেকে ধরেছিলেন আফিমের নেশা। অথচ এই মানুষই ছিলেন ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য কবিদের মধ্যে সব থেকে সৌন্দর্যপিপাসু। সৌন্দর্যলীলার অংশরূপেই তিনি দেখেছিলেন মানুষ আর প্রকৃতিকে। ধর্ম, ইতিহাস, রাষ্ট্র, সমাজের তর্ক বিতর্ক কলকোলাহল থেকে বহুদূরে বসে তিনি করে গেছেন সৌন্দর্যলক্ষ্মীর একনিষ্ঠ সাধনা। সেখানে উদার আকাশে, উন্মুক্ত বাতাসে, সবুজের সমারোহে তিনি এক তন্নিষ্ঠ সাধক। বিশ্বের সকল রঙ, রূপ, রসকে তিনি উপলব্ধি করেছেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। প্রকৃতি তাঁর চিরসহচরী, তাঁর জীবনসুধা। প্রকৃতির আরতি, কল্পনার বিস্তার, সৌন্দর্যের সাধনা, অতীত ও মধ্যযুগের প্রতি গভীর টান এবং সবকিছুর ওপরে এক বিষাদের সুর তাঁর কবিতাকে

অনন্য করে রখেছে। গ্রীকদের মতোই তিনি প্রকৃতির চিন্ময়ী অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর Endymion, Lamia, Hyperion প্রভৃতি কবিতার আখ্যানে গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'Endymion' কবিতার প্রথম পংক্তিতে কীটস লিখেছিলেন"সৌন্দর্য চিরদিনই মানুষের আনন্দের উৎস।" জীবনের কালো দিককেও তিনি সৌন্দর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হতে দেখেছিলেন, সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "সৌন্দর্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য" (Beauty is truth, truth beauty) তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে ওড-গুলো সর্বশ্রেষ্ঠ। আঠারোটি ওডের মধ্যে—Ode to Autumn, Ode to Nightingale, Ode on a Grecian Urn, Ode to Melancholy, Ode on Indolence এবং Ode to Psyche বিশেষ উল্লেখ্য। এগুলি আত্মলীন গীতিকবির আশ্চর্য বাণীরূপ। কীটস অনেকগুলি সনেট লিখেছিলেন, যার প্রথমদিকে ইতালীয় সনেটের প্রভাব ও পরে শেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। এগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল,—Much have travelled in the Realms of Gold, I cry your mercy, Four seasons, When I have fears that I shall cease to be, The day is gone ইত্যাদি।

এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার কারণ এটি বোঝানো ক্ল্যাসিক্যাল যুগের বাঁধা গতে না চলে এঁরা প্রত্যেকে নিজের নিজের চিন্তাচেতনার আকাশে ডানা মেললেন নিজেদের মতো করে। আপন আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ভাস্বর হল সৃষ্টি যা নিঃসন্দেহে সঞ্চার করল নতুনত্ব—আধুনিকত্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে, ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশ্ব প্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থূল ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীটসের কাব্যে। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরেছিল।" প্রত্যেক যুগেই প্রত্যেক দেশেই বহুকাল ধরে চলে আসা কিছু অভ্যাস 'রীতি'তে বা 'আচারে' পরিণত হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসার ফলে তা সমাজে বা ব্যক্তিগত মানুষের মনে একেবারে চেপে বসে। রক্ষণশীল মনোভাবের মানুষেরা তাকেই 'সাধু', 'সাধু' বলতে থাকেন এবং গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানোকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কিন্তু প্রত্যেক যুগেই আবার কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা নতুন কিছু ভাবতে চান, করতে চান, তাঁরাই নিঃসন্দেহে 'আধুনিক' হন। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বললেন,--"সাহিত্যকেও এক এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে—রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটা তিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্ন্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সেযুগে রীতির বেড়া ভেঙ্গে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত।" এবং এই সূত্রেই এল ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কীটস-এর কাব্যকৃতির কথা।

এরপর রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের দিকে ইঙ্গিত দিলেন যে যুগে কবিরা তাদের অন্তরের গভীর অনুভূতিকে ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলে তাকে করে তুলতে চেয়েছেন নিত্যকালের সামগ্রী। তাঁরা নিজের চারপাশের অতি পরিচিত জগৎটাকেই সাজিয়ে তুলতে চাইলেন সুন্দর করে যা তাঁদের অন্তরের

অনুরাগের প্রকাশ। জীবনের দৈনন্দিন চলনকেই রসসিক্ত করার জন্য তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন নতুন নতুন সুর,ধাতুতে, কাঠেতে, রেশমে, পশমে নানা শিল্পকলা। এমনকি স্ত্রীও সেখানে সঙ্গিনী মাত্র ছিলেন না, ছিলেন 'প্রিয়শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ'। মোটকথা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে সেযুগে 'মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।' সেই একই আত্মিকতা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন লেখক ও পাঠকের মধ্যে। কবি তাঁর রুচিমতো কল্পনার দ্বারা যে জগৎ তৈরী করতেন সেই জগৎ থেকে যেন নিমন্ত্রণ যেত পাঠকের দরবারে আর পাঠকও তাঁদের মনোমত কবির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেই রসের রসিক হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—"ওয়ার্ডসওয়ার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়। বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকের নিজের হয়ে উঠত।" অর্থাৎ পূর্বের আচরণকে অন্ধভাবে মেনে না চলে তাঁরা শুনলেন নিজেদের মনের কথা, সেই কথা নিজেদের মতো করে ভাষায় প্রকাশও করলেন,--"দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা।"

কিন্তু আজ যা আধুনিক কাল তা আধুনিক থাকেনা। রবীন্দ্রনাথের সময়ে এসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটসের সময়কে 'মধ্য ভিকটরীয় প্রাচীনতা' আখ্যা দিয়ে দেওয়া হল। সাহিত্য আবার বাঁক ফিরল শুরু হল নতুন চলন। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, সবকিছুকে আতস কাচের নীচে ফেলে দেখার যুগ। এ যুগে মোহ মায়ার রহস্যাবরণ অপসৃত। রবীন্দ্রনাথের মতে,-"এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খটখটে আধুনিকতা।" প্রসাধন তা ব্যক্তি মানুষের হোক বা সাহিত্যের, তা এখনো চলে কিন্তু তা বড়ো প্রকাশ্যে, উদ্ধত ভঙ্গিতে। সেখানে কোনো আবরণ রাখার দায় নেই। আমরা বলি সৃষ্টির মূলে আছে মায়া, বিজ্ঞান বলে তার মূলে আছে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফিজিওলজি, সাইকোলজি অর্থাৎ যুক্তি। যুক্তির দ্বারা ইশারা, ঈঙ্গিত, লুকোচুরি, লজ্জার আবরণ, সত্যের আভরণ ছিঁড়ে ফেলাই বিজ্ঞানের কাজ। আর এযাবৎ কাল পর্যন্ত ঐগুলি সৃষ্টিকর্তারই তৈরি ভেবে ছন্দে-বন্ধে ভাষায় তাকে ধরা ছিল সাহিত্যের কাজ। এযাবৎ কাল সাহিত্যিকেরা যা করেছেন তা রবীন্দ্রনাথ ভারী সুন্দরভাবে বলেছেন,-- "ঈশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল, লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধে নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে ঊষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ।" কিন্তু এখন,--"আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে; ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়।" এরপরই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন সমস্ত আবরণ, আভরণ, মোহমায়ার পর্দা, রহস্যের মাধুর্য ঘুচিয়ে দিলে সৌন্দর্যও কি ঘুচে যায় না? সৃষ্টির সাথে সৌন্দর্যের যে গভীর সম্পর্ক সেখানে কি ছেদ পড়েনা? তাঁর জিজ্ঞাসা"সৃষ্টিতে যে আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃস্ব হতে হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ দেখলেন চোখের সামনে বদলে গেল যুগের ধরণ, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় মানুষও হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। জীবিকার টানে সে কেবলই ছুটছে। বেঁচে থাকার তাগিদে ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত মানুষের "মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়ের অভাব।" যে মানুষেরা একদিন প্রতিদিনের সংসারকেও রসে বসে রাখত সে এখন তাড়াতাড়ি করে কোনরকমে প্রয়োজনটুকু মেটানোর তাগিদে নির্ভর করছে যন্ত্রের উপর আর নিজেও হয়ে পড়ছে যান্ত্রিক। অনাত্মীয় অজানা জনতার ভীড়ে সময় কাটাতে কাটাতে মানুষের আত্মীয় বৃত্ত ক্রমাগত ছোট হয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে মনের মিল খোঁজার ইচ্ছা। এখন তার আমোদ প্রমোদও 'হুড়মুড়' করে। বেছে বেছে শুধু সুন্দরকে, ভালোবাসার সামগ্রীকে নিয়ে পথচলার সময় নেই। ভালোমন্দ সবকিছুর উপর দিয়েই সে ছুটছে কেবলই ছুটছে। তার জীবনের দর্পণ সাহিত্যেও একই প্রতিচ্ছবি, --"হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।"

কাব্যের অঙ্গনেও একই গতি লক্ষ্য করলেন রবীন্দ্রনাথ খুব স্বাভাবিক ভাবেই। সেখানেও আজ পছন্দ সই জিনিস খুঁজে চলার দায় নেই। বিজ্ঞানের জগতে ঝাড়াই-বাছাই চলে না কারণ যে যন্ত্র বিজ্ঞানের দান সে যন্ত্রের মন নেই। সে শুধু বোতাম টিপে দিলে কাজ করে, বোতাম বন্ধ করলে কাজ থামিয়ে দেয়। সে কাজ ভালো না মন্দ সে বিচার সে করেনা, বরং ইচ্ছা অনিচ্ছার বোঝার বাইরে যে যন্ত্র যত স্বয়ংক্রিয় তার মূল্য তত বেশি। ব্যক্তি মানুষের গুরুত্ব সেখানে কোথায়? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,--"আমি কী ইচ্ছা করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিকমত কী সেইটেই বিচার্য।" আর 'আমাকে' বাদ দেওয়া মানে আমার মোহ, অনুরাগ, ভালোলাগা, মন্দলাগা বাদ হয়ে যাওয়া। এখানেই সাহিত্য 'ব্যক্তিগত খুশির দৌড়' থেকে ভিন্ন রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

ছন্দের পারিপাট্য, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য এসব নিয়ে ভাবার সময় বা ইচ্ছে কোনোটাই একালের সাহিত্যিকের নেই। সমস্তরকম প্রসাধন বর্জিত হয়ে চলাই হয়ে পড়ল এযুগের দস্তুর। এবং সবথেকে বড়ো কথা সেই মনোভাব যে সবসময় স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেল তা নয়, জোর করে 'আধুনিক' হওয়ার তাগিদে জোর করেই অতীতের অভ্যাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করতে লাগলেন সাহিত্যিকেরা। এই জোর করে কিছু করাতেই রবীন্দ্রনাথের তীব্র আপত্তি। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন, - "তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে ব্যায়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্রায় বাছা-বাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা।" এই জোর করে স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই সমর্থন করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ।

এই বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ H. Monroe এবং A.C Henderson সম্পাদিত 'The New Poetry' (১৯১৮) কাব্যগ্রন্থটি থেকে একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানে লেখা আছে,—

"I am the greatest laughter of all–

Greater than the sun and the oak-tree–

Than the frog and Appollo—

I laugh all day long."

এই কবিতায় সূর্য, ওকগাছ, অ্যাপোলোর সাথে এই যে ব্যাঙকেও একই পংক্তিতে বসানো হোলো এটিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জোর করে মোহ ভাঙার চেষ্টা। কারণ ব্যাঙকে অবজ্ঞা না করলেও একথা সত্যি "যে হাসি সূর্যের, যে হাসি ওক বনস্পতির, যে হাসি অ্যাপলোর"সে হাসি কখনো ব্যাঙের হতে পারে না সে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যত সাম্যবাদী দৃষ্টি খাড়া করা হোক না কেন। রবীন্দ্রনাথের মতে এ হলো "পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাচ বসানোর চেষ্টা।" যেখানে ব্যাঙের হাসির কথা এসেছে সেখানে সমুদ্রের হাসির কথা বললে এখনকার যুগ যদি বলে "ওটা দস্তুরমতো কবিয়ানা" তাহলে রবীন্দ্রনাথের মতে, - "তার চেয়ে অনেক বেশি উলটো ছাঁদের দস্তুরমতো কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, সহজ কলমের কথা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।"কবিত্বকে প্রকাশ না করার জন্যও যদি জোর করা হয় সেও রবীন্দ্রনাথের মতে কবিত্ব।

এরপর রবীন্দ্রনাথ 'The New Poetry'-গ্রন্থে থেকে Amy Lowell-এর কবিতা 'A lady'-র কয়েকটি পংক্তি অনুবাদ করেছেন। যার দুটি লাইন,-

"You are beautiful and faded/Like an old opera tune."

এই কবিতার তর্জমা করে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন উক্ত মোহভাঙার আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে অতীতের যা কিছু সুন্দর ছিল তাকে ব্যঙ্গ করা। অতীতের সমস্ত রহস্যাবরণ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার বিশ্লেষণের শেষে বলেছেন,—"সাবেক কালের যে মাধুরী তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।"

তাহলে কি এগুলোর কোন মূল্যই নেই কবিতা হিসেবে? তা তো হতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাগুলির শক্তির জায়গাটিরও অনুসন্ধান করেছেন। দেখেছেন সেই শক্তি হল নৈব্যক্তিকতায়। উক্ত কবি এমি লোয়েলের আর একটি কবিতা 'Red slippers'. কবিতাটি লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। কবিতাটিতে রয়েছে সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা দিয়ে হাওয়া বইছে আর দোকানে পালিশ করা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে জমাট বাঁধা রক্তের মতো লাল চটিজুতোর মালা। ঐ চটিজুতো নিয়ে দোকানদার বা খরিদ্দার কারোরই কোন মাথা ব্যাথা না থাকলেও যে এমন করে দেখল তার দেখার বিষয়টি অমূল্য হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ এই দেখাটিকে বললেন নৈব্যক্তিক বা impersonal. এই দেখা তাঁর ভাষায়,--"ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে

হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না।" এই আত্মতার মূল্যেই কবিতার মূল্য।

রবীন্দ্রনাথ এরপর এজরা পাউণ্ডের একটি কবিতা যেটির নাম 'The study in Aesthetics' সেটির প্রসঙ্গ তুলে এযুগের মানুষের 'সুন্দর'কে দেখার দৃষ্টিও যে কতটা বদলে গেছে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। সে কবিতার শুরুতে আছে,-

"The very small children in patched clothing
being smitter with an unusual wisdom."

কবিতায় উল্লেখিত 'Children' একটি ছোটো ছেলে যে একটি মেয়েকে দেখে বলে উঠেছিল 'সুন্দর'। সেই আবার বছর তিনেক পরে বাক্সে সাজানো সার্ডিন মাছে হাত বুলিয়েও বলছে 'সুন্দর'। দুটিকেই একইভাবে সুন্দর বলা দেখে কবি বললেন,- "I was mildly abashed." কারণ তিনি বুঝলেন এ দেখা কেবল দেখা, এরমধ্যে হৃদয়ের দেখা নেই।

এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিলেন "কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা।" বিষয়ীর আত্মতা বলতে বোঝায় কবির মনোমত প্রকাশভঙ্গি। সে প্রকাশভঙ্গি সুন্দর হয়ে ওঠে অলঙ্কারের ব্যবহারে, ভাষার সৌকর্যে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুভূতি ও তার একান্ত নিজস্ব প্রকাশ। এ হল উনিশ শতকের বৈশিষ্ট্য, বিশ শতকে জোর দেওয়া হল বিষয়ের ওপর, সেখানে শিল্পে, সাহিত্যে বাস্তবকে একেবারে বাস্তবের মতো করে গ্রহণ করার প্রবণতা প্রাধান্য পেল। বাস্তব অলঙ্কার, উপমাকে নয়, জোর দেয় বস্তুকে অর্থাৎ নিজেকে। রবীন্দ্রনাথের মতে এখনকার সাহিত্য তাই বলল,--"আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য।" এর ফলে এই যাথার্থ্যকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে কোনোকিছু বাছ বিচার না করে সবকিছুকেই মেনে নিতে প্রস্তুত হল আধুনিকরা। সে মানায় ময়ূর, শকুনি, শুয়োর, হরিণ নির্বিচারে সবই বসে গেল একই পংক্তিতে। সাহিত্যেই হোক বা চিত্রকলাতে সুন্দর বা অসুন্দরের দোহাই দিয়ে কাউকে গ্রহণ বা কাউকে বর্জন করার বিষয়টি আর থাকল না। এটিই সঠিক কিনা স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল, যাইহোক তিনি দেখলেন—"এইজন্য আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। উদাহরণ হিসেবে তিনি এলিয়টের 'Prufrock and other observations' কবিতা থেকে একটি শীতের সন্ধ্যার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। T.S Eliot (১৮৮৮-১৯৬৫) আমেরিকার কবি, বাস করেছেন ইংল্যাণ্ডে। হাভার্ড, প্যারিস ও অক্সফোর্ডে দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন প্রচুর। তার ওপর গভীর প্রভাব ছিল মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠী, জেকোবিয়ান যুগের নাট্যকার, ফরাসী প্রতীকধর্মী কবিকুল এবং দান্তের। যাইহোক, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে এলিয়ট ঘোষণা করেছিলেন জেহাদ। তিনি নিজেকে বলতেন ক্ল্যাসিসিষ্ট। তিনি দেখেছিলেন বিংশ শতাব্দীতেও চলছে পুরাতনের অনুবৃত্তি। উক্ত 'Prufrock and other

observations' কাব্যগ্রন্থে তিনি নতুন যুগের বক্তব্যকে নিয়ে উপস্থিত হলেন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন আধুনিক যুগের বর্বরতাকে। পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে কিছু করেননি তিনি। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি এলিয়টের কবিতায় দেখলেন বাসি বিয়ার মদের গন্ধমাখা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। খেলো সংসারের কথা লিখলেও এ সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণাই প্রকাশ পেয়েছে এলিয়টের ঐ খেলো সংসারের বর্ণনার মধ্যে দিয়েই। এ যেন আধুনিক কবির অভিনব রোমান্টিক অনুভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,- "একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতাকে সকালবেলার প্রথম জাগরণের সাথে তুলনা করলেন যার কিছুটা স্পষ্ট কিছুটা অস্পষ্ট। সেখানে অন্তরের চাওয়াকে মানুষ নানা মায়া দিয়ে গড়ে তোলে। অতঃপর দিনের আলো যত বাড়ে, অস্পষ্টতা যায় ঘুচে, মায়াজাল ছিন্ন হয়, প্রখর বাস্তব এসে সামনে দাঁড়ায়। সে বাস্তবকে এক এক কবি গ্রহণ করেন এক এক ভাবে। পাশ্চাত্যের সাহিত্য প্রখর বাস্তবের মুখোমুখি কিভাবে এসে দাঁড়ালো তারও কারণ বিশ্লেষণ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিকভাবেই। আমরা সবাই জানি সমস্ত পৃথিবী জুড়েই বিশ শতকে পালাবদল ঘটিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ, সভ্যতার ভিত্তিকেই যা দাঁড় করিয়েছিল প্রশ্নের মুখে। মানুষের প্রতি মানুষের ভরসা, আস্থা সবকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, চিড় ধরেছিল আত্মবিশ্বাসেও। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে খুব সংক্ষেপে পুরো পরিস্থিতিকে তুলে ধরলেন,--"গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুদূর প্রচলিত যত-কিছু আদব ও আব্রুতা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল, দীর্ঘকাল যে সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস করে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল; মানুষ যে সকল শোভনীয়রীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিশ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র বলে জানত তাকে দুর্বল বলে আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় বলে অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল—বিশ্ব-নিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা বলে আজ ধরে নিয়েছে।"

পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক সবকিছুকেই অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টিতে দেখাকে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেননি, এটিকেও তাঁর 'চিত্তবিকার' বলেই মনে হয়েছে। রোমান্টিকতাকে যদি 'মোহ' বলে পরিত্যাগ করতে হয় তা হলে রবীন্দ্রনাথের মতে,- "এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করার গভীরতা নেই।" সেই সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা,- "অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করিনে।"খুব সুন্দরভাবে বিষয়টিকে বুঝিয়ে তিনি বললেন ইনফ্লুয়েঞ্জা হাজার লোককে আক্রমণ করলেও সেটাই শেষ সত্য নয়, ইনফ্লুয়েঞ্জার আড়ালে সহজ দেহস্বভাবটিই চিরকালীন সত্য। তাহলে তাঁর মতে আধুনিকতা কী? রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার জবাব খুঁজেছেন। তাঁর মতে বিশ্বের প্রতি ব্যক্তিগত আসক্তিমুক্ত নির্বিকার তদ্‌গত দৃষ্টি যাঁর আছে তিনিই দেশকাল নিরপেক্ষভাবে শাশ্বত আধুনিক।

যে আধুনিক 'শাশ্বত' তাকে শুধু সমসাময়িকতার প্রেক্ষিতে 'আধুনিক' বলাটা রবীন্দ্রনাথের কাছে 'বাজে কথা'। প্রায় হাজার বছর আগে লেখা চীনের কবি লি-পো বিশ্বকে যে চোখে দেখেছিলেন তার মধ্যে আধুনিকতার লক্ষণ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে বিষয় প্রচলিত কিন্তু রসের অভাব নেই, বিদ্রূপ না করেও যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়া যায় এ কবিতা তারই প্রমাণ। আবার এলিয়টের একটি কবিতায় দেখা যাচ্ছে অভিজাত পরিবারের এক মহিলা মারা গেলে শব বাহকেরা প্রস্তুত হচ্ছে ওদিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা ডিনার টেবিলের ধারে বসে বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিলো। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুললেন এটি ঘটনা হিসেবে সত্য কিন্তু এরমধ্যে কবিতা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য,--"চীনে কবিতার পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল, তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে বিশ্বকে দেখেছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত।" এই ভাঙন ধরা বিশ্বকে যেভাবেই হোক দেখানোকে 'আধুনিকতা' বলে মেনে নিতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। এও তো একধরণের বাছাই—খারাপ জিনিসকে বেছে বেছে দেখানোর প্রক্রিয়া। শুধু সুন্দরকে বাছা যদি একঘেয়েমি হয়, শুধু অসুন্দরকে দেখানোটাও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য,--"যদি বলা হয়, আগেকার কবিরা বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে; এরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে।"

আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যেন 'অঘোরপন্থী'। বেছে বেছে দূষিত জিনিসে যাদের পক্ষপাত। এ প্রসঙ্গে তিনি Edwin A Robinson এর 'রিচার্ড কোডি' নামক কবিতার অনুবাদ করে দেখালেন আপাতসুন্দর সুখী জীবনের অন্তরালে বাসা বাঁধছে হতাশার ঘুণপোকা। তাই শান্ত বসন্তের রাতে কোনো কারণ ছাড়াই রিচার্ড কোডি নিজের মাথায় চালিয়ে দিলেন গুলি। জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে ভীষণভাবে মনে পড়ে।

আমরা সবাই জানি প্রতিটি জীবনের শেষে আছে মৃত্যু তাই বলে বেঁচে থাকাটা মিথ্যে হয়ে যেতে পারেনা। শ্মশান বৈরাগ্য বৈরাগীকে মানায়, কবিকে নয় কারণ কবি কবিতা লেখেন জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকে। আধুনিক যুগ এতটাই জরাজীর্ণ হয়ে গেল যে কবিকেও লাগলো শ্মশানের হাওয়া? এটি স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি রবীন্দ্রনাথের। তাঁর স্পষ্ট কথা,-"বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেন্টিমেন্টালিজম্, তার প্রতি গায়ে পড়া বিরুদ্ধতাকে সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না।" বুড়িয়ে যাওয়া মনের পক্ষপাত দুষ্ট সাহিত্য সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বলতেই নারাজ। তাই 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের শেষে তাঁর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত,-"সায়াহ্নেই

বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।"

৩০৯.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় কত সালে প্রকাশিত হয়?

২. 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করো।

একক - ৪

নিয়মের রাজত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিন্যাসক্রম

৩০৯.১.৪.১ ভূমিকা

৩০৯.১.৪.২ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিজীবন

৩০৯.১.৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রাবন্ধিক জীবন

৩০৯.১.৪.৪ আলোচ্য প্রবন্ধের উৎস সূত্র

৩০৯.১.৪.৫ আলোচ্য প্রবন্ধের সারাংশ

৩০৯.১.৪.৬ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

৩০৯.১.৪.৭ প্রবন্ধের Style বা শৈলী

৩০৯.১.৪.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.১.৪.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩০৯.১.৪.১ ভূমিকা

বাংলা রেনেসাঁর মর্মবাণী যে সকল মনীষীর মাধ্যমে বাঙালির মানসপটে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) অন্যতম। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৪ সালের ২০ আগস্ট। বাড়িতে পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ সকলেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ফলে শৈশব থেকেই তিনি বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, নবজীবন, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকার দেখা পেয়েছেন। আর তাই লেখালেখির প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রবল ছিল। নবজীবন পত্রিকায় 'মহাশক্তি' নামে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে তার লেখক জীবনের যাত্রা শুরু। এরপর দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, পরিভাষা এবং প্রধানত বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা ছিল তার প্রধান আগ্রহের বিষয়। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করার পর শিক্ষাবিভাগে একাধিক চাকরি শেষে রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে জীবনের শেষ দিন অতিবাহিত করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী চিন্তায় ছিলেন দার্শনিক, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ছিলেন বৈজ্ঞানিক আর এই দুইয়ের প্রকাশ ঘটাতেন সৌন্দর্যময় সাহিত্যশিল্পীর নিপুণ কারুকার্যে। তার প্রতিটি রচনা প্রাঞ্জল ভাষায় কৌতুকরসে জারিত ও তাত্ত্বিক যুক্তিতে শাণিত। রচনার সৃজনশীলতা ও উপস্থাপনের মৌলিকত্বের কারণে তিনি সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে ছিলেন সমানভাবে সমাদৃত।তার সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশ্লেষণ যথার্থ— " তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ।"

৩০৯.১.৪.২ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিজীবন

প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।বাবার নাম গোবিন্দসুন্দর এবং মা চন্দ্রকামিনী। বাংলাভাষার চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর, কিন্তু জন্মসূত্রে তিনি বাঙালি ছিলেন না। তার পূর্বপুরুষরা জিঝোটিয়া ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায় রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মের দু"শবছর আগে থেকেই মুর্শিদাবাদে বসবাস করতো। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে তাদের সকলের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং এক অর্থে তারা বাঙালিদের মতই বাংলার চর্চা করতে শিখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের সূচনার আগেই ১৮৭৮সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে জেমো রাজপরিবারের নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ কন্যা ইন্দুপ্রভাদেবীর সাথে তার বিয়ে হয়।

শৈশবকাল থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৮৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এর ফলে ২৫টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং একটি স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পান। একই কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি.এ.পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।পদার্থবিদ্যার এম.এ.। পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণির প্রথম হন। ১৮৮৮-তে পান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি। গবেষণা শুরু করেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে পারলেন না। কারণ তার সামনে তখন স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নয়নের ক্ষেত্র। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, পুরাতত্ত্ব, পুরাণ, বেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তার আগ্রহ এবং কৌতুহল তার চিন্তনের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছিল।

৩০৯.১.৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রাবন্ধিক জীবন

বাংলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের কাছে বিজ্ঞান প্রচার তার একটি অসাধ্য সাধন কাজ। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মেলবন্ধন উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি বিজ্ঞানী হয়েও সার্থক সাহিত্যিক। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় সেবছর তার আহ্বানে একদিন সমগ্র বাংলাদেশে অরন্ধন দিবস পালিত হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় এসময় তিনি রচনা করেন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৬) গ্রন্থখানি। তার রচনা মুক্ত চিন্তার আলোকে দীপ্ত ও সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য

সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে: প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৩), কর্মকথা (১৯১৩), চরিতকথা (১৯১৩), শব্দকথা (১৯১৭), বিচিত্রজগৎ (১৯২০), নানাকথা (১৯২৪)প্রভৃতি। প্রথমটি বিজ্ঞানবিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। 'শব্দকথায়' বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে আর 'নানাকথায়' স্থান পেয়েছে যুগ ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ, শিক্ষানীতি ও সমাজধর্মের কতিপয় প্রচলিত সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত।

বাঙালিদের মধ্যে বেদচর্চার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎ কৃত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ (১৯১১) ও যজ্ঞকথা (১৯২০) গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে। এছাড়া তিনি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ও রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে Aids to Natural Philosophy গ্রন্থখানি বিখ্যাত।

রামেন্দ্রসুন্দরের পান্ডিত্য ছিল বহুমুখী। উচ্চতর গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানের কোনো মূল্যবান আবিষ্কার বা কোনো সুচিন্তিত তথ্যাবলি স্থাপন না করেও বিজ্ঞানের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তার গবেষণার কল্যাণস্পর্শে বিশ্বের বিজ্ঞানভান্ডার পূর্ণতা লাভ না করলেও, বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতিতে তার অবদান চিরস্মরণীয়।

৩০৯.১.৪.৪ আলোচ্য প্রবন্ধের উৎস সূত্র

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি 'ভারতী পত্রিকায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি প্রাবন্ধিকের 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ক) বৈজ্ঞানিক খ) বিজ্ঞানদর্শন এবং গ) দার্শনিক।এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যেমন, মাধ্যাকর্ষণ, বর্ণতত্ত্ব, উত্তাপের অপচয়, নিয়মের রাজত্ব'প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে সহজ-সুন্দরভাবে বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পরিবেশন করেছেন। 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) তে প্রাবন্ধিকের চিন্তাজগতের সন্ধিলগ্ন ঘটেছে। বিজ্ঞান থেকে কিভাবে তিনি চিন্তাধারাকে দর্শনের সীমায় পদক্ষেপ ঘটিয়েছেন, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। পূর্ববর্তী 'প্রকৃতি' পর্বে তিনি কয়েকটি নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। জগৎরহস্যের এই অন্বেষণে বিজ্ঞান তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাশ করেছে। তখন তিনি উত্তরের সন্ধানে আশ্রয় নিয়েছেন দর্শনবিদ্যার কাছে। দর্শনবিদ্যাও কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে প্রাবন্ধিককে তুষ্ট করতে পারেনি। তখন আবার তিনি দর্শনের বিচার ও তর্কবহুল পথ পরিক্রমা করে বিজ্ঞানবিদ্যার কাছেই মীমাংসার পথ অনুসন্ধান করেছেন। এভাবে বিজ্ঞান থেকে দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে তাঁর চিন্তার সূত্রগুলি আনাগোনা করেছে বারবার। কিন্তু বিজ্ঞান, দর্শন কোনো বিদ্যাই জগৎরহস্যের কিনারা করতে সক্ষম হয়নি। তাই জগৎরহস্যের গোড়ার কথাস্বরূপ এই প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আজও জিজ্ঞাসাই থেকে গেছে। এই মূলভাবনা থেকেই আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিকে সাজানো হয়েছে।

৩০৯.১.৪.৫ আলোচ্য প্রবন্ধের সারাংশ

আমাদের আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্ব' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি প্রাবন্ধিক সরস বর্ণাভঙ্গির মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। এই বিশ্বপ্রকৃতির রাজ্যে যা কিছু দেখা যায়, সবই এক প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে আবর্তিত। এটাই হলো লেখকের বক্তব্য। তার মতে যা আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি, তার মধ্যে নিয়ম নেই মনে হতে পারে কিন্তু যেকোনো সময় একটা অঘটন ঘটে পূর্ববর্তী নিয়মকে ভেঙ্গে দিতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের এই ঘটনাকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের নতুন সংজ্ঞা গড়ে নিতে হয়। তাই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলে সেই ব্যতিক্রমকেই নিয়ম হিসেবে মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। এই চিন্তারই সূত্রায়িত প্রতিফলন ঘটছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

৩০৯.১.৪.৬ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের রহস্যভেদে প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাসূত্রকে আলোচ্য প্রবন্ধে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে দুটি স্তরে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম স্তরে তিনি পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ ও চাপ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'প্রাকৃতিক নিয়ম কি?' এভাবে তিনি প্রবন্ধের সূচনা করেছেন। আমরা জানি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে সমস্ত পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভৌম-আকর্ষণের কারণে উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ না করে মাটিতে নেমে আসে। যেমন, আমগাছ থেকে আম মাটিতে পড়ে, নারকেল গাছ থেকে নারকেল মাটিতে পড়ে ইত্যাদি।

প্রকৃতির রাজ্যে এর নিয়মভঙ্গ নেই। তাই কেউ যদি বলে, আমি দেখলাম নারকেল গাছ থেকে নারকেল বৃন্তচ্যুত হয়ে উপরে উঠে গেলো, সেটা মনুষ্যলোকে পাগলের প্রলাপ বলে বিবেচিত হবে। আবার এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচারও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন ভরা বোম্বাই নারকেল কিংবা লোহার স্বাভাবিক ধর্ম জলে ডোবা, শোলা জলে ভাসা ইত্যাদি। এই নিয়মেরও আবার ব্যতিক্রম আছে; লোহাকে পারদের মধ্যে ফেললে লোহা ভাসে এবং শোলাকে জল থেকে তুলে ঊর্ধে ছুঁড়ে দিলে তা ভূমিতে পড়ে। তখন স্বপক্ষের যুক্তি লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু এবং জলও বায়ুর অপেক্ষা গুরু আবার পারদ লোহা অপেক্ষা গুরু তাই পারদের মধ্যে লোহা ভাসে।

'প্রাকৃতিক নিয়ম যে অলঙ্ঘ' এ মতটিকে আরও দৃঢ় করার জন্য কিছু ভাষাগত সংশোধন করা হয়েছে। প্রথমত, পার্থিব বস্তু মাত্রই নীচে নামে, কিন্তু তা যখন অন্য কোনো বস্তুর সন্নিধানে যেমন, বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলমধ্যে, পারদমধ্যে থাকলে তখন উভয়ের লঘু-গুরু বিচার্য। বৈজ্ঞানিক ভাষায় পার্থিব বস্তুর পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী বল বা আকর্ষণকে বলা হয় 'মাধ্যাকর্ষণ'। আর কোনো বস্তুকে আকাশের দিকে উৎক্ষেপণ করাকে বলা হয় 'চাপ'। অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ নামায়, চাপ উপরে ঠেলিয়া ওঠায়। যেখানে যার জোর বেশি সে সেখানে কার্য করে।

এরপর প্রাবন্ধিক সুকৌশলে 'প্রাকৃতিক নিয়মের' রহস্যভেদের আলোচনাকে পর্যায়ক্রমিক সিদ্ধান্তে এসেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতির রাজ্যে 'রাজত্বের' রূপকে আইন-শৃঙ্খলার এক রূপক পরিবেশ তৈরি করেছেন এভাবে—

১নং ধারা পার্থিব আকর্ষণেই বস্তু নিম্নগামী হয়।

২নং ধারা তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তুমাত্রই ঊর্ধগামী হয়।

৩নং ধারা আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই একসঙ্গে কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হলে ভূপৃষ্ঠে নামায় এবং চাপ প্রবল হলে উপরে ওঠায়।

আপাতভাবে আমাদের মনে হয় এ নিয়মের কোনো ব্যভিচার নেই। কিন্তু এ নিয়মের যে ভবিষ্যতে বিপরীত হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে ঘটমান দৃশ্যাবলীর সাজুজ্জে আজ যা নিয়ম ভবিষ্যতে তার বিপ্রতীপ অবস্থান হতে পারে, সেদিন থেকেই ওটাই প্রকৃতির নিয়ম বলে মান্য হবে।

দ্বিতীয় স্তরে প্রাবন্ধিক এসেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য এক স্তরের নিয়মরহস্যের কিনারা ভেদে। আমরা দেখলাম আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম স্তরে পার্থিব বস্তুর চাপ ও আকর্ষণের প্রসঙ্গ আলোচিত হলো এবং দ্বিতীয় স্তরে অপার্থিব ও সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের আকর্ষণ নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে গেছেন। সৌরজগতও যে নিয়মের অধীন, প্রাবন্ধিক তার নাম দিয়েছেন 'মহানিয়ম'। যেটা নিয়মের আবিষ্কর্তা স্যার আইজাক নিউটন। এই মহাজাগতিক 'মহানিয়ম' এর ব্যভিচার —ব্যতিক্রম সম্পর্কে লেখক একের পর এক বক্তব্য রেখেছেন এবং তার বিশ্লেষণ করেছেন। এক, সৌরজগতের এই 'মহানিয়ম' সর্বত্র নাও ঘটতে পারে কিন্তু সেখানে অন্য কোনো নিয়ম থাকবেই কারণ বিশ্বজগৎ নিয়মের অধীন। দুই, আপতঅর্থে দৃশ্যমান কোনো ঘটনাকে প্রচলিত নিয়মের ব্যভিচার ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে কিন্তু এটা পুরোপুরি সত্য নয়। আসলে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের অভাবে আমাদের এধরণের ভাবনা হতে পারে। কাজেই 'নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব নিয়ম'টাই আবার নিয়ম বলে পরিচিত হবে। তিন, প্রাবন্ধিকের মতে বিশ্বজগতে যা ঘটে, তার নিয়মের বাইরে নয় কারণ ঘটমান বা ঘটা প্রতিটি ঘটনার একটি 'সম্বন্ধ' বা 'শৃঙ্খলা' বর্তমান। সাধারণ জ্ঞানে আমরা সেই 'সম্বন্ধ' বা 'শৃঙ্খলা'কে আবিষ্কার করতে পারি না। তখন আমরা তাকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ভুল করি। এরজন্য প্রয়োজন হয়'অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার।

প্রাবন্ধিক আলোচনার উপসংহার করেছেন এভাবে যে, বিশ্বজগতে সর্বত্র নিয়মের এই বন্ধন দেখে আমাদের বিস্মিত বা আনন্দিত হবার কোনো কারণ নেই। যেহেতু এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু নতুন ঘটছে যা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিধির বাইরে। নিরন্তর ঘটমান বা চলমান এই ঘটনার প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন সম্পর্কে মানুষের বিবিধ মত বর্তমান।

৩০৯.১.৪.৭ প্রবন্ধের Style বা শৈলী

শৈলীর দিক থেকে আলোচ্য প্রবন্ধটির বিন্যাসপদ্ধতি অনেকক্ষত্রেই অভিনব। প্রথমেই আমরা দেখব প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করার জন্য প্রাবন্ধিক নিয়ম-কানুন-আইনকে রূপকের আধারে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু প্রবন্ধের শিরোনামে 'রাজত্ব' শব্দটি যুক্ত আছে। তাই আইন-প্রণয়ন প্রবর্তনের এই বিষয়টি আগাগোড়া খুব যুক্তিপূর্ণ হয়েছে।

সমগ্র প্রবন্ধটি লেখক-প্রশ্নোত্তরের ছলে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এইভাবে কাল্পনিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গিতে প্রাবন্ধিক তার বক্তব্য বিষয়টির উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে পার্থিব-অপার্থিব জগতের স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রসঙ্গের অবতারণা করে পাঠকের কাছে সহজে পরিবেশন করেছেন। পাঠকের কাছেও কথনভঙ্গির এই Style বা শৈলীটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

প্রবন্ধের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির অভিনব প্রয়াস। যেকারণে প্রাবন্ধিক বিশ্বপ্রকৃতির গূঢ় রহস্যভেদের মতো বক্তব্য বিষয়কে বোঝানোর জন্য তিনি দৃষ্টান্তগুলি গ্রহণ করেছেন পাঠকের চেনা প্রাত্যহিক জগৎ থেকে। যেগুলি অত্যন্ত লঘু ও হাস্যরসাত্মক—

ক. তির্যক উক্তি — প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে বিস্মিত হন, ভাবাবেগে গদগদকণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাঁহাদের শরীরে বিবিধ সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হয়।

খ. লঘু হাস্যরসাত্মক — যেদিন লোষ্ট্রপতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

এছাড়াও অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেমন, পার্থিব বস্তুর মধ্যে লঘু-গুরু বিচারে, রাম-শ্যাম নামক ব্যক্তিকে পদার্থরূপে কল্পনা করে হাস্যকৌতুকের পরিবেশ তৈরি করেছেন। আবার আইজাক নিউটন কর্তৃক প্রকৃতিকে 'মাতৃ' বলে সম্বোধন কিংবা নেপচুন, ইউরেনাস সম্পর্কে সকৌতুক মন্তব্য ইত্যাদি সবই প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির অভিনব দক্ষতার পরিচায়ক। বিজ্ঞানকে কতটা সহজ-সরল সর্বজনবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করা যায় তার পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন এই প্রবন্ধটিতে।

৩০৯.১.৪.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাঁর কোন প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে?

২. 'প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম' সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করো।

৩. 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করো।

৪. প্রবন্ধে বস্তুর 'আকর্ষণ' ও 'চাপ'এর যে নিয়মগুলি আলোচিত হয়েছে, তা উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করো।

৫. 'মহানিয়ম' বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন?

৬. প্রত্যেক ঘটনার 'সম্বন্ধ' ও 'শৃঙ্খলা' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য উপস্থাপন করো।

৭. আলোচ্য প্রবন্ধটির শৈলী বিষয়ে আলোকপাত করো।

৩০৯.১.৪.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. রামেন্দ্রসুন্দর জীবন কথা, আশুতোষ বাজপেয়ী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২. পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী।

৩. রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, গ্রন্থমেলা।

৪. বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

৫. রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, গ্রন্থমেলা।

৬. জিজ্ঞাসা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মজুমদার লাইব্রেরী।

৭.রামেন্দ্রসুন্দর: সেরা রচনা সম্ভার, সমীর রক্ষিত কমল চৌধুরী সম্পাদিত, ডি এম লাইব্রেরী

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৫

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা

প্রমথ চৌধুরী

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.২.৫.১ : ভূমিকা

৩০৯.২.৫.২ : প্রবন্ধের বিশ্লেষণ

৩০৯.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.২.৫.১ : ভূমিকা

বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা প্রবন্ধে নতুন মেজাজ, নতুন ভঙ্গি ও মজলিশি-আলাপের সুর যিনি নিয়ে এলেন তাঁর নাম প্রমথ চৌধুরী।তাঁর জন্ম১৮৬৮ সালে। মৃত্যুসাল ১৯৪৬। প্রবন্ধিক হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর অবদান চিরস্মরণীয়। তীক্ষ্ম যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তিনি অনায়াসে বাংলা প্রবন্ধে নতুনত্ব এনেছিলেন। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'তেল-নুন-লকড়ি', 'বীরবলের হালখাতা', 'নানাকথা', 'নানাচর্চা' ইত্যাদি। পরিচ্ছন্ন চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মননশীলতা ছিল তাঁর প্রবন্ধ জুড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ ইস্পাতের ছুরি।নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র তাঁর গাণ্ডীব।'

চলিত ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে 'বীরবলের হালখাতা'প্রবন্ধগ্রন্থের 'কথার কথা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।"বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কথ্যভাষার একটি মার্জিত লেখ্যরূপও তৈরি করেছিলেন তিনি। 'সবুজপত্র" পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্যাটায়ারিস্ট প্রবন্ধের স্রষ্টা।

৩০৯.২.৫.২ : প্রবন্ধের বিশ্লেষণ

এক.

সাধারণত সাধু ভাষা বলতে আমরা বুঝি সংস্কৃত শব্দবহুল, সুষ্ঠু, সর্বজনবোধ্য, নিয়মবদ্ধ কৃত্রিম ভাষারূপ। এই ভাষার সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায় উনিশ শতকের শুরুর দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লেখনিতে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই ভাষায় লেখনি শুরু করেন। তবে এই ভাষার সর্বজনগ্রাহ্যরূপ গড়ে তোলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

অন্যদিকে চলিত ভাষা হল নবদ্বীপ থেকে কলকাতা অবধি গঙ্গা তীরবর্তী বসবাসকারী ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের কথ্যরূপ। এই ভাষায় সংস্কৃতের প্রতি কোনও আনুগত্য নেই। এই ভাষা সর্বজনবোধ্য, সহজ, সরল।প্রমথ চৌধুরীর রচনাতেই বাংলা চলিত ভাষার যথার্থ রূপ ফুটে উঠেছে। এই রূপকে বলা হয় আদর্শ চলিত বাংলা।

দুই.

আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা ভালো, বঙ্গসাহিত্যের জন্য যা শ্রেয় চিরদিন তার ওকালতি করেছেন প্রমথ চৌধুরী।বাংলা সাহিত্যে সাধু ভাষা কতটা উপযোগী, চলিত ভাষা কতটা কার্যকরী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রমথ চৌধুরীর 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক যে প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রবন্ধটির সঙ্গে প্রাবন্ধিকেরই এক সতীর্থ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়-এর একটি প্রবন্ধের নামের মিলের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গত মিলও লক্ষ করেছেন প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিক, ললিতবাবুর প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন"যাঁহারা সাধু ভাষায় অতিমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা যদি কখনো দায়ে ঠেকিয়া একটি চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন, তবে সেটা উদ্ধারণচিহ্নের মধ্যে লেখেন; যেন শব্দটা অপাঙক্তেয়, সাধু ভাষা শব্দগুলি সংস্পর্শজনিত পাপে লিপ্ত না হয়, সেই জন্য এই সাবধানতা। ইহা কি জাতিভেদের দেশে অনাচরণীয় জাতিদিগের প্রতি সামাজিক ব্যবহারের অনুবৃত্তি?"

প্রাবন্ধিক বলছেন যে,তাঁরা দু'জনেই অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী ও ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃভাষার ওপর এইরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু ললিতবাবুর সঙ্গে প্রাবন্ধিকের মতামতের একটি পার্থক্য আছে।প্রথমত ললিতবাবু সাধু ভাষার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যা বলার আছে তা তিনি বলেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে।কোনওরকম মীমাংসা তিনি দেননি, দিতেও নারাজ। কিন্তু প্রাবন্ধিক উদ্ভুত সমস্যার কী মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ললিতবাবুর 'মনের ঝোঁক আসলে বঙ্গভাষার দিকে, তবুও তিনি পদে পদে সে ঝোঁক সামলাতে চেষ্টা করেছেন।'

প্রাবন্ধিক সে চেষ্টা করেননি বরং তিনি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যা ন্যায্য মনে করেছেন, তার জন্য ওকালতি করাটা কর্তব্য মনে করেছেন। তাই,"সেই কারণে আমি আমার নিজের মত কেবলমাত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকি নে, সেই মতের অনুসারে বাংলা ভাষা লিখতেও চেষ্টা করি।"

প্রমথ চৌধুরী মনে করেছেন, লেখার একটা বিশেষ রীতি সাহিত্যে প্রচলন করতে হবে। কারণ দুটো পথ নিয়ে চলা অসম্ভব। যেখানে ললিতবাবু বলেছেন, "সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা, এই মামলার মীমাংসা করিতে হইলে আধা ডিক্রি আধা ডিসমিস ছাড়া উপায় নেই।" এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে "তরমিন ডিক্রি লাভে বাদীর খরচা পোষায় না। ওরকম জিত প্রকারান্তরে হার। এক্ষেত্রে আমরা যে বাদী, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের নাবালক অবস্থায় সাধুভাষীদের দল সাহিত্যক্ষেত্র দখল করে বসে আছেন। আমরা শুধু আমাদের অন্বয়গত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি।"

কিন্তু প্রতিবাদীরা জানে যে আমাদের মাতৃভাষার যে দাবি তা 'তামাদি' হয়ে গেছে। তাই বিচারপতির কাছ থেকে ডিগ্রি পাবার আশা আমরা আর করি না, আমাদের জবর দখল করে নিতে হবে তবেই বাংলা সাহিত্য আমাদের আয়ত্তের ভেতরে আসবে।

লক্ষ করা গেছে, সমাজে ও সাহিত্যে যে রীতি বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসছে সেই রীতি কেন চলে আসছে তার জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি আমাদের। কিন্তু প্রাবন্ধিক বলছেন যে, সমাজ সম্বন্ধে এই মতের সার্থকতা থাকলেও সাহিত্যের সঙ্গে এই মতের কোনও সম্বন্ধ নেই। যে লেখায় বুদ্ধি এবং মানবমনের পরিচয় পাওয়া যায় না, তা সাহিত্য নয়।

তিন.

প্রাবন্ধিক বলছেন, "যদি কোনো একটি বিশেষ রীতি সমাজে কিংবা সাহিত্যে কিছুদিন ধরে চলে যায় তাহলে সেটি নিজের ঝোঁকের বলেই অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে inertia তারই বলে চলে।" ললিতবাবু সাধু ভাষার স্বপক্ষে যে দুটি যুক্তি দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথমটিতে তিনি বলেছেন, "সাধু ভাষা আর্টের অনুকূল।" আর দ্বিতীয়টিতে বলেছেন, "চলিত ভাষার অপেক্ষা সাধুভাষা হিন্দুস্থানি মারাঠি গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেদের নিকট অধিক সহজবোধ্য।"প্রাবন্ধিক এই দুটি মতের ঘোর বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলছেন যে, যখন কোনও যুক্তি দাঁড় করাতে অসুবিধা হয় তখন 'আর্ট'-এর মতো বড় বড় কথার অন্তরাল গ্রহণ করে মানুষ। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য সাধু ভাষার মতো কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনও স্থান নেই।

'ভারতী' পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রাবন্ধিকের'কথার কথা'নামক একটি প্রবন্ধে তিনি সাধু ভাষা সম্পর্কে বিদেশি লোকেদের ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাই এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। যারা বাংলা ভাষাতে সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্যের জন্য বিদেশীয়ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছে তাদের ধারণা হয়তো এই উপায়ে একদিন ভারতে সর্বত্র এক ভাষা হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো বহু দেশের বহু জাতির ভাষা তাদের বিশেষত্ব হারিয়েএক হয়ে উঠবে এমন আশা কারও করা উচিত নয়। রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের একমাত্র উপায় হিসেবে প্রাবন্ধিক বলেছেন নানা জাতির বিশেষত্ব রক্ষা করে এক সূত্রে বন্ধন করা।

প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী এই প্রবন্ধে বলছেন, "বঙ্গ সাহিত্যের যত শ্রীবৃদ্ধি হবে, তত তার স্বাতন্ত্র্য আরো ফুটে উঠবে, লোপ পাবে না।" ললিতবাবু পণ্ডিতি বাংলার উপর রুষ্ট হলেও, প্রাবন্ধিক তাতে রাজি নন। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শব্দের 'মিষ্টি'প্রয়োগ না করলেও কোনও ভুল প্রয়োগ করেননি। কেননা 'প্রবোধচন্দ্রিকা' বা 'পুরুষপরীক্ষা' পড়লে আমরা বাংলা না শিখতে পারলেও সংস্কৃত ভুলে যাই না।

এখানে প্রাবন্ধিক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, "অল্প কথায় একটি গল্পকে কি করে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে বলতে হয়, তার সন্ধান তিনি জানতেন।" ললিতবাবু যেখানটাই পুরুষপরীক্ষার ভাষাকে 'শব্দড়ম্বরময় জরিমা জড়িত ভাষা' মনে করেছেন, সেখানে প্রাবন্ধিক বলছেন, "সে ভাষা নদীর জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং স্রোতস্বতী।" প্রাবন্ধিকের ধারণা, যদি নতুন লেখকেরা 'প্রবোধচন্দ্রিকা' পাঠ করে তাহলে ওই রচনা সম্বন্ধে অনেক সদ্-উপদেশ লাভ করতে পারবে।

চার.

উল্লেখ্য, রাজা রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বাংলা লেখার দোষ ধরা সহজ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হয় যে, এঁরাই হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক।বাংলা গদ্য লেখার রচনা পদ্ধতি এঁরাই উদ্বোধন করেছিলেন। তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল শব্দ নিয়ে নয়, বাক্যের গঠন নিয়ে। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে, কারণ আমরা ওই পদ্ধতিতে গদ্য লিখি না। আমরা ইংরেজি গদ্যের সহজ গতি অনুসরণ করি। রামমোহন রায়ের গদ্যে কোনও বাগাড়ম্বর নেই, সমাস নেই, না আছে সংস্কৃতের বহুল ব্যবহার।

প্রাবন্ধিকের মতে, সর্বপ্রথম প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার গদ্যকে আমরা 'Standard Prose' হিসেবে দেখি। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্যের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের গদ্য পড়লে সহজেই এই পার্থক্যটা বোঝা যায়।দু'জনের ভাষা বা গদ্য আলাদা হয়ে উঠেছে বাক্যগঠনের গুণে।

প্রাবন্ধিক লিখেছেন, "এইসব কারণেই পণ্ডিতি বাংলার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বঙ্গভাষার কোনো ক্ষতি করেননি, বরং অনেক উপকার করেছেন।" কারণ সে ভাষা কোনওনতুন লেখক অনুকরণ করেন না। তাঁর মতে, আসল সর্বনাশে ভাষা হল 'চন্দ্রাহত সাহিত্যিক'-দের 'খিচুড়ি ভাষা'। তাঁর ধারণা, সেই ভাষার থেকে যদি বঙ্গ সাহিত্য উদ্ধার না পায় তাহলে আঁতুড়েই মারা যাবে। তিনি বলছেন যে,সেই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হলে মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোনও উপায়নেই।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে আরবি, পারসি ও ইংরেজির অনুপ্রবেশকে ললিতবাবু প্রাকৃতিক নিয়ম বলে মনে করেছেন। সাহিত্যচর্চা বা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচারণ করে কোনও লাভ নেই সে কথা প্রাবন্ধিক মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে সকল বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে সেই শব্দগুলো মানুষের কথ্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষাতেও প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা উচিত। কোনও শব্দের উৎপত্তি বিচার করে লেখক সেটিকে সাহিত্যের থেকে বের করে দিতে পারেন না। এতে ভাষা সংকীর্ণ হয়ে যায়।

তাঁর মতে, বাংলাভাষা বাঙালি হিন্দুর ভাষা। এদেশে ইসলাম ধর্মের উদ্ভবের অনেক আগে থেকে গৌড়ীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল। তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়ীদেশীয় ভাষা উত্তমা সর্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য-হেতুক।" গৌড়ীয় প্রাকৃত অন্য সকল প্রাকৃত অপেক্ষা ভালো কি মন্দ সে বিচার না করে তিনি বলেছেন যে, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্বন্ধ খুবই কাছের।

অন্যদিকে সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে ভাষাশব্দ তিন প্রকার। তজ্জ, তৎসম ও দেশ্য। বাংলা ভাষায় তজ্জ এবং তৎসম শব্দের সংখ্যা বেশি। দেশে শব্দের সংখ্যা অল্প এবং বিদেশি শব্দের সংখ্যা খুবই অল্প। এ বিষয়ে ফরাসি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিল লক্ষ করা যায়। ফরাসি ভাষা যেরকম ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলা ভাষাও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ঠিক একই রকম সম্পর্কিত।

পাঁচ.

একজন ইংরেজি লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রাবন্ধিক বুঝিয়েছেন, "With a very few exceptions, every word in French vocabulary comes straight from Latin. The influence of pre-Roman Celts is almost imperceptible, while the number of words introduced by the Frankish conquerors amount to no more than a few hundreds." Frence-এর জায়গায় বাংলা ভাষা, pre-Roman-এরজায়গায় আদিম অনার্য জাতি, Latin-এর জায়গায় সংস্কৃত আর Frankish-এর জায়গায় মুসলমান বসিয়ে নিলেই বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তা যথার্থ হয়ে ওঠে।

প্রমথ চৌধুরী ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের গুণমেলাতে গিয়ে আবারও উদ্ধৃত করেছেন পূর্বোক্ত লেখকের উদ্ধৃতি। যেমন,"French literature is absolutely homogeneous. The genius of the French language, descended from its single stock has triumphed most-in simplicity, in unity, in clarity, and in restraint." তাই বাংলা ভাষায় অঙ্গীভূত হয়নি এমন সব শব্দ ঢোকানোর চেষ্টা বাংলা ভাষাকে বিকৃত করে ফেলবে বলে প্রাবন্ধিকের ধারণা। এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিপোর্টে এই প্রস্তাবই ঢাকা-চাপা দিয়ে করা হলে, সেটা যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে সেটাই বলতে চেয়েছেন তিনি। তজ্জ শব্দকে তৎসম করলে বাংলা ভাষার ধর্ম নষ্ট হয় না। কিন্তু অপরিচিত ও বিদেশি শব্দকে আমাদের সাহিত্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়াতে বাংলা ভাষার বিশেষত্ব নষ্ট করে দেওয়া হয়। তাই প্রবন্ধ শেষে প্রাবন্ধিকের ক্ষেদোক্তি, "এই উভয়সংকট হতে উদ্ধার পাবার একটা খুব সহজ উপায় আছে। বাংলা ভাষা হতে বাংলা শব্দসকল বহিষ্কৃত করে দিয়ে অর্ধেক সংস্কৃত এবং অর্ধেক আরবি-পারসি শব্দ দিয়ে ইস্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করলে, দু কূল রক্ষে হয়!"

এক্ষণে বলে রাখা ভালো রাষ্ট্রীয় উপায়েভাষার ক্ষেত্রে একতা গঠন করা সম্ভব হয়নি। হবেও না কখনও। ভারতের সব প্রদেশে এক ভাষা হবে এটি অতীতে হয়নি, বর্তমানে হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

আসলে বিবিধের মাঝে মিলনই মহান। তাই কবি লিখেছেন, "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান।/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।।"

৩০৯.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. প্রমথ চৌধুরীর লেখা 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধের মূলভাব বুঝিয়ে দাও।

২. 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রমথ চৌধুরীর প্রাবন্ধিকসত্তা বিচার করো।

একক - ৬

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

বিন্যাসক্রম

৩০৯.২.৬.১ : অন্নদাশঙ্কর রায়—জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

৩০৯.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৯.২.৬.১ : অন্নদাশঙ্কর রায়—জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৪ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিমাইচরণ রায়, মাতা হেমনলিনী দেবী। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় উড়িষ্যার একটি পাঠশালায়। ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। তিনি ঢেঙ্কানাল রাজসরকারের বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে ১৯২৩ সালে আই.এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন প্রথম স্থানাধিকারী হয়ে। ১৯২৫ সালে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েও প্রাদেশিক বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ১৯২৭-এ আই.সি.এস. পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম হন এবং শিক্ষানবিশি হিসেবে ইংল্যান্ডে গমন করেন। অন্যদিকে তিনি তিন চার বছর ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্যচর্চা করার পর সিদ্ধান্ত নেন বাংলা ভাষার সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ইংল্যান্ডে বাসকালেই তিনি এই কাজের জন্য প্রস্তুতি পর্ব সেরে রাখেন শুরু হয় বাংলায় লেখালেখি। শিক্ষানবিশি সমাপ্ত করে জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালি ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করে ১৯২৯-এর তিনি ভারতবর্ষে ফিরলেন এবং কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন বাংলাদেশকে। এর কারণও স্পষ্ট। তিনি মনেপ্রাণে চাইলেন বাঙালি সাহিত্যিক হতে। ইতিমধ্যেই ‘পথে প্রবাসে’র লেখক হিসেবে তাঁর পরিচিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বিচিত্রা’য় ধারাবাহিক ভাবে তা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সময় থেকেই বাংলার সাহিত্যিক মহলেও তাঁর যোগাযোগ বাড়তে শুরু করল। অচিত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, বিষ্ণু দে, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের সাথে গড়ে উঠল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি লিখে ফেললেন বৃহৎ গুরুগম্ভীর উপন্যাস ‘সত্যাসত্য’। কর্মসূত্রে প্রায় পুরো বাংলাদেশ ঘুরেছেন

অন্নদাশঙ্কর, বাদ যায়নি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ কিংবা বিশ্বভ্রমণ। সাহিত্যসাধনাও চলেছে নিরঙ্কুশ ভাবে। ৪৭-এর দেশভাগ তাঁকে খুব বড়ো ধাক্কা দিয়েছিল। লিখেছিলেন সেই ছড়া যা আজ প্রবাদে পরিণত,—''তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো। তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো! তার বেলা?'' বাংলা ভাগ পরবর্তী কালে মন্ত্রিসভার সাথে মতে না মেলায় চাকরিতে ইস্তফা দেন। তারপর থেকে নিজেকে পুরোপুরি ব্যাপৃত করেন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত বাংলা সাহিত্য সাধনায়। লেখেন আঠারোটি উপন্যাস, অসংখ্য ছোটগল্প, কবিতা, ছড়া, ভ্রমণ সাহিত্য, প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। এছাড়াও রয়েছে ওড়িয়া ভাষায় লেখা সাহিত্য। ২০০২ সালের ২৮শে অক্টোবর এই মহাজীবনের অবসান ঘটে।

কৈশোর কাল থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠেন অন্নদাশঙ্কর। সেই পাঠ ধীরে ধীরে তাঁকে রবীন্দ্র-অনুরাগী করে তোলে। ১৯২৪ সালে পাটনা কলেজে পড়ার সময় তিনি হঠাৎই একদিন চলে যান শান্তি নিকেতনে এবং সাক্ষাৎ হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাথে। এরপর শান্তিনিকেতনের সাথে ছিল তাঁর আমৃত্যু যোগাযোগ। আমাদের আলোচ্য 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে।

প্রবন্ধের নামকরণ থেকে বোঝা যায় সাহিত্যিক বা কর্মী রবীন্দ্রনাথই শুধু এখানে আলোচ্য নন, লেখকের মতে পুরো জীবনটাকেই যিনি শিল্প করে তুলেছেন তাঁকেই এক ঝলক দেখে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। শুরুতেই বলে রাখা ভাল মাত্র কয়েক পাতার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতো মহাসাধকের জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করা অসম্ভব এবং সে চেষ্টাও অন্নদাশঙ্কর করেননি। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটি ভরকেন্দ্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

শিল্পী হলেই যে কারোর জীবন গোছানো হতে তা নয় আবার শিল্পী নাহলেও কারোর জীবনের ছন্দটা এমন হয় যে তাঁদের জীবনটাই শিল্প হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই দুয়ের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যাবে। অন্নদাশঙ্কর অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় অন্নদাশঙ্কর সেই মেলবন্ধনকে চিহ্নিত করে লিখেছেন, —''রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরূপ কাব্যের মতো করে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে যতটুকু দেখেছেন অন্নদাশঙ্কর তাতে তাঁর মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনাচরণে একটা সম্পূর্ণতার ভাব আছে অর্থাৎ সবই যেন পরিকল্পনা মাফিক ঘটে চলেছে, কোথাও কিছু খাপছাড়া নেই। এমনটা দেখেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য ''কেমন ভাবে বাঁচব?'' কেউ যদি এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন তাহলে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের জীবনকে অনুসরণ করতে হবে।

সেই অনুসরণ করতে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পটভূমি ও সময়কালকে চিহ্নিত করেছেন। তবে সবটাই করেছেন ছোট ছোট তুলির স্ট্রোকে অর্থাৎ বর্ণনাত্মক নয় বরং খুব সরল ছোট ছোট বাক্যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। পটভূমি বোঝাতে গিয়ে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন ভারত পথিক রামমোহন রায়ের কথা। রামমোহন রায়ের চিন্তাভাবনা ও কর্মোদ্যোগ যে তাঁর যুগের প্রবণতা থেকে অনেক এগিয়ে ছিল সেকথা আমরা সবাই জানি। রামমোহনের মতাদর্শ ঠাকুর পরিবারে কি প্রভাব ফেলেছিল তাও আমরা

জানি। আচার-সংস্কারের অচলায়তন কে রবীন্দ্রনাথ যে সারাজীবন ধরে ভাঙতে চেষ্টা করেছেন তাঁর দীক্ষা রামমোহনের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্নদাশঙ্করের ভাষায়,—''এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হয়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত।'' অন্যদিকে আমরা সবাই জানি সংসারে থেকেও মহর্ষি উপাধি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপনিষদের একটি ছেঁড়া পাতায় লেখা শ্লোক বদলে দিয়েছিল তাঁর জীবনদর্শন। পিতার প্রভাব পুত্রের উপর পড়বে এতো খুব স্বাভাবিক।

দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক বোধের জগতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের সেই যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সেই বোধই তাঁর ভেতর জাগ্রত থাকল আমৃত্যু। তবে শুধু ঔপনিবেশিক ভাবনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না মহর্ষি, জ্ঞানের বিচিত্র পথে তাঁর পদচারণাও নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের মনে নানাবিধ প্রবণতা তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকে বাঙালির মননে, যাপনে যেটুকু আলো সঞ্চারিত হয়েছিল এবং যে আলোয় মিশে গিয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার রশ্মি সে আলো প্রক্ষেপনে অনেকখানি ভূমিকা ছিল ঠাকুরবাড়ির। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বরী দেবী এবং এঁদেরকে ঘিরে থাকা আলোকবৃত্তের অধিকারী সে ঠাকুরবাড়িও যে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গড়ে তোলার অন্তরালে তাতে সন্দেহ কি! প্রাসঙ্গিক ভাবেই অন্নদাশঙ্কর লিখলেন,—''ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁকে Geology-র গ্রন্থ পড়তে দেখা গেছিল। ..... ধর্মে ও কর্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্যে ও বিশ্বমানসিকতায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল। স্কুল কলেজের অপেক্ষা রাখেনি। এই পরিবারের কাছে ও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা।''

অন্যদিকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ না করা রবীন্দ্রনাথের জীবনে আশীর্বাদ বলেই মনে হয়েছে অন্নদাশঙ্করের। বিদ্যালয়কে "Grainding machine" বলা রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যালয়ে পড়েননি এটা অন্নদাশঙ্করের মতে শাপে বর হয়েছে। কারণ বিদ্যালয়ের রুটিন এগজামিনের চাপে মানুষের কল্পনাবৃত্তি এবং সহজাত প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় বলে মনে করেছেন প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথেরও হয়তো সেই দশা হত কিন্তু তিনি স্কুলের চার দেওয়ালের থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন এবং তাতে মহাবিশ্বের জ্ঞানের দরজা খুলে গিয়েছিল তাঁর কাছে। সিলেবাসের বন্ধন খুলে গিয়েছিল বলে তাঁর পিতার মতোই উপনিষদ থেকে Geology-তে ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। তাই অন্নদাশঙ্কর একদিকে যেমন লিখেছেন—'তাঁর মতো বহুবিদ্যা ব্যক্তি যে কোনো দেশে বিরল' তেমনি তাঁর অধীত বিদ্যার ফলাফল জানাতে ভোলেন নি,—''রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িত করে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে থিসিস লেখেননি। তাঁর লঘুতম রচনাতেও মার্জিত বুদ্ধির যে দীপ্তি দেখতে পাই সে-দীপ্তি অশিক্ষিত পটুত্বের নিদর্শন নয়।'' রবীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্যের সব শাখাতে সমান কৃতিত্ত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তেমনি 'ছিন্নপত্র' ইত্যাদি লেখা, পড়লে বোঝা যায় পাঠক হিসেবেও তিনি ছিলেন 'সর্বভুক'। প্রাবন্ধিকের মতে এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ একদিকে প্রকৃতির অন্তরের কথাকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন নিপুণভাবে অন্যদিকে আমাদের প্রতিটি অনুভূতিকে কান্না হাসির দোলায় দুলিয়ে দিতে পেরেছেন।

একথা মনে করা ভুল যে রবীন্দ্রনাথ এই যে স্কুল কলেজের পাঠ গ্রহণ করলেন না এটিকে তাঁর পরিবার খুব সহজভাবে মেনে নিয়েছিল। তা একদমই নয়, তাঁর তাঁকে দেশে ও বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজের জীবনের পথ সেই শুরু থেকে নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর একেই বলেছেন জীবনের শিল্প রচনা। যাঁরা প্রকৃত শিল্প হন তাঁরা এই পথ খুঁজে নিতে ভুল করেন না। অন্নদাশঙ্করের ভাষায়,—''জীবনশিল্পী এমনি করেই নিজের পরিচয় দেন। পশুপক্ষীর ইনষ্টিংকেটর মতো শিল্পী প্রকৃতি মানুষের মধ্যে ইনটুইনের ক্রিয়া অমোঘ।''

পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুসারে রবীন্দ্রনাথ অতিক্রান্ত কৈশোরে বা বলা চলে যৌবনের প্রারম্ভে প্রথম বার বিলাত গেলেন এবং তারপর সারাজীবনে বহুবার। এই বিলেত যাত্রার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং সৃষ্টিকর্মে গভীর প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়েছে প্রাবন্ধিকের। কারণ চোখে না দেখে শুধু বইয়ের পাতার জ্ঞান কখনোই মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে না। এই যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন সমগ্র বিশ্বের দরবারে সেখানে তাঁর বিদেশ যাত্রার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলেছে। এই যে তিনি প্রাচ্যের ভূমিতে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যের উপহারকে গ্রহণ করলেন উদার মন নিয়ে তাঁর ফলে মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, অহংকার ও মোহ কিছু কমে এবং নিজের ও পরের মাঝখানকার সত্যকার সীমারেখাটি আবিষ্কৃত হয়।''

রবীন্দ্রনাথ বারবার বিভিন্ন প্রবন্ধে বলেছেন ('যেমন—'লোকহিত') পরের হিত করতে চাইলেই করা যায় না। হিত করারও অধিকার অর্জন করতে হয়। না হলে উপচার দয়ায় পরিণত হয় আর দয়ার দান সবসময় মনুষ্যত্বের হানি ঘটায়, দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রেই তা সত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মতামত নিজের জীবনাচরণেও পালন করতেন যে প্রমাণ তো ভুরিভুরি রয়েছে। অন্নদাশঙ্কর জমিদার রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে এই দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি যে পরহিত করেছেন তা দয়ার দান নয়, তা গঠনমূলক পরিকল্পনা, শিলাইদহ-সাজাদপুর-পাতিঘর-কালিগ্রাম এবং পরবর্তীতে শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞ তারই প্রমাণ। অন্নদাশঙ্কর লিখলেন,—''পরোপকার করতে চাইলেও করা উচিত নয়, যদি তার ফলে পরের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হয় বিড়ম্বিত। আমাদের দরিদ্রনারায়ণ সেবা, কাঙালী ভোজন ইত্যাদি আদর্শ এমন অস্বাস্থ্যকর যে, যথার্থ করুণা ও লোকপ্রীতির পৌরুষ তাতে নেই।''

এরপর অন্নদাশঙ্কর প্রাচীন ভারতবর্ষের কিছু আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখেছেন সেখানে ভোগের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেখানে সংযমে পৌঁছতে হয়। রবীন্দ্রনাথকেও বলতে শুনি,—

''বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।''

সন্ন্যাস গ্রহণই ভারতবর্ষের একমাত্র ধর্ম-ভাবনা নয়, যে সম্পদ বৃদ্ধি হলে বা বিজ্ঞের মতো ব্যবহার করলে উন্নতি হয় তাকে রক্ষা করতেও বলেছে। রবীন্দ্রনাথও এমন আদর্শে বিশ্বাস করতেন বলেই প্রাবন্ধিকের মতে হয়েছে।

চিঠিপত্র মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের জায়গা। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের ছবিও পাওয়া যাবে নিশ্চয় এমন বহু চিঠিপত্রে। যেমন জগদীশচন্দ্র বসুর সাথে তাঁর চিঠিপত্র আদান-প্রদানে গাহস্থ্য জীবনের কিছু মুহূর্ত ধরা আছে বলে দেখেছেন অন্নদাশঙ্কর। সেইসাথে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ চিঠিও লিখেছেন এত যত্নে যে সেগুলোই সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন লেখনীকেই তুচ্ছ করেন নি সে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রই হোক কিংবা সচেতন সাহিত্যসৃষ্টি। যা বাইরে প্রকাশিত হবে, জগতের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তাতেই যেমন যত্নের ছাপ থাকে এমনটিই মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ অন্নদাশঙ্করের ভাষায়,—''তুচ্ছ বা মহৎ কোনো কাজই তাঁর পক্ষে হেলাফেলার যোগ্য নয় এবং তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি সর্বমুহূর্তে সতর্ক থাকে পাছে তাঁর বহিঃপ্রকৃতিতে কিছুমাত্র কুল্লীলতা বা মামুলিয়ানা একটিও হয়ে পড়ে।''

বাস্তব জগৎ হোক বা বোধের জগৎ রবীন্দ্রনাথের সকল কার্যের মূলে ছিল সমন্নয় সাধনের প্রচেষ্টা। ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে চলার ইচ্ছা। ঝাঁ-চকচকে নগর জীবনের দিকে আমরা যখন আগুন দেখে পতঙ্গের মতো ছুটে চলেছি তখন রবীন্দ্রনাথ নগর এবং পল্লী দুয়েরই প্রয়োজন উপলব্ধি করে কলম ধরেছেন এবং উন্নয়ন যজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। একথা ঠিক তাঁর ভালবাসা এবং আকর্ষণ পল্লীর প্রতি অধিক ছিল। ইট-কাঠ-পাথরের নগরজীবন থেকে তিনি পালাতে চেয়েছেন বারবার, নগরের বদলে ফিরে পেতে চেয়েছেন অরণ্য কিন্তু আধুনিক নাগরিক জীবনকে একেবারে পরিহার করার কথা বলেন নি, তার প্রয়োজনীয়তা ও তিনি উপলব্ধি করেছেন। 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখা হল,—''প্রকৃতির সুধা ও জনসংঘাত মদিরা পান করে তিনি উভয় সত্যের স্বাদ গ্রহণ করলেন।''

এরপরে অন্নদাশঙ্কর স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। আমরা সবাই জানি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তাঁর লেখা গান কবিতায় মুখরিত হয়েছিল বাংলার আকাশ-বাতাস। বাঙালির ভেতর জেগে ওঠা সে স্পন্দন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি রবীন্দ্রনাথ। নিভৃত সাহিত্য সাধনা তাঁর স্বক্ষেত্র হলেও তিনি যখনি বুঝেছেন দেশের তাঁকে প্রয়োজন তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন নিজের মতো করে। আর এটা তিনি আকস্মিকভাবে করেছেন তা নয়, তাঁর পরিবারেই ছিল এই শিক্ষার পরিসর। খুব ছোট্ট করে হলেও অন্নদাশঙ্কর চমৎকার ভাবে এই এটিকে চিহ্নিত করেছেন—''দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র পণ্য নিবন্ধ ছিল না, দেশের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁরও অনুরাগের সামগ্রী ছিল। দেশের শিল্পদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা স্বদেশী আন্দোলনের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই করে আসছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জনা কয়েক মিলে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকানও খুলেছিলেন।'' আর এরপরেই সবচেয়ে দামী কথাটা বললেন অন্নদাশংকর। একথাটা রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন যে দেশে জন্মালেই দেশ নিজের হয়ে যায় না। সেই দেশকে মনে-প্রাণে-সেবায়-কর্মে নিজের করে গড়ে তুলতে হয়। সেটাই লিখলেন প্রাবন্ধিক,—''দেশে জন্মেছি বলে দেশ আমার নয়, দেশকে নিজের তনুমন দিয়ে সৃষ্টি করেছি বলে দেশ আমার, পেট্রিয়টিজমের এই সূত্রটি দেশকে রবীন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিলেন।''

এই ভাবনাটিকে সার্থক প্রমাণ করে পরবর্তী পরিচ্ছদের শুরুতেই অন্নদাশঙ্কর লিখলেন,—''দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আধুনিক কালের উপযুক্ত করে দেশকে একদিক থেকে সৃষ্টি করার ব্রত নিলেন তিনি এই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন—ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা।" আমরা সবাই জানি শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন নিজস্ব পন্থায় ভাবনা চিন্তা করে গেছেন। পৃথিবীর যেখানেই গেছেন সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং একার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তারই গোড়াপত্তন। আমরা সচরাচর যে আশ্রম বুঝি এটির সাথে তার তফাৎ আছে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলো সন্ন্যাসীরা যে অর্থে আশ্রম বোঝেন এটি সে অর্থে আশ্রম হবে না অর্থাৎ এখানে গৃহত্যাগীরা বাস করেন না, বরং ছাত্রদের শেখানো হবে গৃহে থেকেও কিভাবে ত্যাগের আদর্শ পালন করা হয়। এখানে সেইজন্য গার্হস্থ্যাশ্রম আর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সমন্বয় হয়েছে বলে মনে হয়েছে অন্নদাশংকরের। তিনি দেখেছেন এখানে শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণ হয় না। এখানে প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অন্নদাশঙ্কর লিখলেন—''ব্রহ্মচর্যাশ্রমী বালকের দেহ-মনকে নানাদিকে স্ফূর্তি দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ খেলা, অভিনয়, গান ও উপাসনা এগুলিকে বিদ্যাশিক্ষার মতোই প্রয়োজনীয় বলে গোড়া থেকেই জেনেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বা নীতিশিক্ষাকে স্ফীত হতে দেননি এবং অপরগুলিকে ওর কোনোটার বাহন করেননি। বিদ্যার্জনই বালকের একমাত্র বা প্রধান করণীয়, সভ্যসমাজ থেকে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার যদি কোনো দিন ঘোচে তবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ ও জগৎ আর একটু ভালো করে বুঝবে।"

যিনি লিখতে পারেন,—

''মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যামসমান"—বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না মৃত্যু সম্বন্ধে কী গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন তিনি এবং যেটি হয়েছিল তাঁর জীবনজোড়া মৃত্যুর উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে। যে বেদনা তিনি নীরবে সহ্য করেছেন তাকেই সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন অপূর্ব রসমণ্ডিত করে। কি অপূর্ব ভাষায় লিখেছেন—

''দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক।" (পূজা পর্যায়)

অন্নদাশঙ্কর মৃত্যুর এই অমৃতময় রূপ দেখতে পেয়েছেন 'খেয়া'য়, 'গীতাঞ্জলি'তে। অন্নদাশঙ্কর অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় লিখলেন,—''তাঁর জীবন ও তাঁর কাব্য যেন এমন একটা পরিণতির প্রতীক্ষা করছিল। ফলের পক্কতার পক্ষে প্রখর রৌদ্রের প্রয়োজন ছিল।" মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সেই 'প্রখর রৌদ্র' যার ফলে ''তাঁর মধ্যে কারুণ্যের সঞ্চার না হলে তিনি সকলের সব কালের কবি ও প্রতিভূ হতে পারতেন না।" মাথুরের আগুনে দগ্ধ হয়ে রাধা যেমন মিলিত হয়েছিলেন ভাবসম্মিলনে পরম পুরুষের সাথে ঠিক তেমনি মৃত্যুর বেদনার মধ্যে দিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পেলেন 'পরাণ সখা' যে, লিখলেন,—

''আমি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

পরাণসখা বন্ধু হে আমার।।" (গীতাঞ্জলি)

এই অপরূপ লীলা প্রত্যক্ষ করে অন্নদাশংকর লিখলেন,—''তিনি ভগবানের মধ্যে হারানো প্রিয়দের সঙ্গ পেলেন, তাই ভগবান হলেন তাঁর প্রিয়তম। যিনি এতদিন পিতা ছিলেন, তিনি হলেন সখা ও প্রেমিকা 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' রচিত হলো।"

রোগশয্যায় বসে লেখা কয়েকটি কবিতায় ইংরেজি তর্জমা রবীন্দ্রনাথ পড়তে দেন আইরিশ কবি ইয়েটস কে। তারপর তো ইতিহাস তৈরী হল। যে তর্জমা তাঁকে এনে ছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। স্বদেশে যাঁরা এতদিন শুধুই তাঁর সমালোচনা করেছেন তাঁরাও মালা হাতে দৌড়লেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দুঃখে যেমন 'অভিভূত হননি সুখের দিনেও তিনি অভিভূত হলেন না। অন্নদাশংকর আগেও রবীন্দ্রনাথের এই ভারসাম্য বজায় রাখার শক্তির কথা বলেছেন। যাইহোক, যশ, অর্থ, সম্মান কিছুই তাঁকে বিচলিত করল না। এক পরাধীন দেশে জন্মেও তিনি দিগ্বিজয় করলেও কত সহজে। আসলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল বিশ্বজয়ের। একদিন পদ্মা নদীতে গ্রামবাংলায় নিভৃত পরিবেশে বাস কালেই তিনি অনুভব করেছিলেন বিশ্বের মূলরহস্য। আর আজ নিঃসংশয় ভাবেই অন্নদাশংকর লিখলেন,—''প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও ব্যাপক যোগাযোগ, মানুষের গভীরতম চরিত্রে আস্থা, ভগবানের কল্যাণবিধানে সংশয়হীন বিশ্বাস, সৌন্দর্যের রসায়নে ব্যবহারিক জীবনকেও রসায়িত করা—এতগুলো বড়ো বড়ো জিনিস কি ছোট ছোট দেশে আবদ্ধ থাকতে পারত? দু-দিন আগে না হলে দু-দিন পরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ত।" অন্নদাশংকরের এই ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস বলে সে সময় মানুষ এক ভয়ংকর খেলায় মেতে ছিল। সে হল জাতিতত্ত্বের খেলা। নিজের জাতিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে গিয়ে 'Nationalism' নামক দানবকে লেলিয়ে দিচ্ছিল অন্য জাতিকে ধ্বংস করার দিকে। আর এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল মানুষ। মানবিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই ঘটনাকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি আমেরিকায়, জাপানে এর বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখলেন এমনকি নিজের বশেও যখন এই জাতীয়তার দৈত্য দেখতে পেলেন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বললেন, এতে দেশে বিদেশে তাঁকে বিরূপতার মুখোমুখি হতে হল তবে আপন কর্মের মধ্যে দিয়েই তিনি তার জবাব দিলেন। যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ।

আসলে রবীন্দ্রনাথ 'নেশনে'র মিলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। মানুষের মিলনে বিশ্বাসী ছিলেন যে, মানুষ দেশ-কাল-সীমার ঊর্ধ্বে। তিনি রাজনীতির বাঁধনে বাঁধতে চাননি মানুষকে, বাঁধতে চেয়েছিলেন শিক্ষার বাঁধনে। তাইতো প্রতিষ্ঠা করলেন 'বিশ্বভারতী', যার মূলবাণী হল,—

অন্নদাশংকরের কলম লিখল,—'রবীন্দ্রনাথ এক প্রকার বে-সরকারী লীগ স্থাপন করলেন, এবং নেশন্‌স নয়—অফ্ কাল্‌চারস্। তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্বের সকলের ভারতী।"

সমাপ্তিতে অন্নদাশংকর রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। এই প্রবন্ধ লেখার পর আরো এগারো বছর জীবিত ছিলেন এই মহামানব এবং ছিলেন সমানভাবেই সৃষ্টিশীল। 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের

উপসংহারে যা লিখলেন অন্নদাশংকর তার সাথে আমরাও একমত,—''রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষরা এই বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন যে, মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে ''কী ভাবে বাঁচব" এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর।"

৩০৯.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ''তাঁর অন্যান্য কীর্তি বিস্মৃত হয়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে জিজ্ঞাসা—''কেমনভাবে বাঁচব"? —সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে চিরস্মরণীয় হবে।" —'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো।

২। 'জীবনশিল্পী এমনি করেই নিজের পরিচয় দেন"—কে, কিভাবে এই পরিচয় দিয়েছেন বুঝিয়ে বলো।

৩। 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের মুল বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লেখ।

৩০৯.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

ক) রবীন্দ্র জীবনকথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ভাদ্র, ১৩৬৬।

খ) অন্নদাশঙ্কর রায় — সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৫।

একক - ৭

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক

বুদ্ধদেব বসু

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.২.৭.১ : ভূমিকা

৩০৯.২.৭.২ : প্রবন্ধের বিশ্লেষণ

৩০৯.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.২.৭.৪ : গ্রন্থঋণ

৩০৯.২.৭.১ : ভূমিকা

বুদ্ধদেব বসু তিনের দশকের আধুনিক কবিদের প্রধান প্রতিনিধি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে বুদ্ধদেব বসু সব্যসাচী ব্যক্তিত্ব। শুধু কবিতা লেখাই নয় কবিদের তিনি সংঘবদ্ধ করেছেন, কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করে নবীন প্রবীণ কবিদের একত্রিত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং 'পোড়ো জমিতে ফাঁপা মানুষের' বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) দীপ্ত আবির্ভাব। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের নতুন কাব্যরীতির সূচনাকারী অন্যতম কবি হিসাবে তিনি সমাদৃত। বুদ্ধদেব বসুর কর্ম ও সাহিত্যজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। আই.এ পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা সম্বল করেই ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে অজিত দত্তের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন। 'প্রগতির' পর 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। এছাড়াও তিনি ১৯৩৮ সালে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী' প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'বন্দীর বন্দনা', 'পৃথিবীর পথে', 'কঙ্কাবতী', 'দয়মন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'শীতের প্রার্থনা', 'বসন্তের উত্তর', 'যে আঁধার আলোর অধিক' ইত্যাদি। রচনার অজস্রতা ও অভিনব লেখনভঙ্গীর দিক দিয়ে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'রাত ভরে বৃষ্টি', 'তিথিডোর', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'মৌলিনাথ' ইত্যাদি। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সমালোচনা, নাটক, কাব্য নাটক, অনুবাদ, শিশুসাহিত্য নিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫৬টি।

আঠেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। বিশিষ্ট কাব্য সমালোচক দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন, "বুদ্ধদেবের কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই।" বুদ্ধদেব বসুসহ তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রবলয় থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কাব্যে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে একে রবীন্দ্র বিরোধিতা মনে হলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আশ্রয়। বুদ্ধদেব বসু একসময় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিনা তাঁর এক দণ্ড চলে না। রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রতিটি খণ্ড নিয়েই আলোচনা করতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। কথাসাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আদিগন্ত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। তার মধ্যে অন্যতম 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রবন্ধটি সাহিত্যচর্চা নামে একটি গ্রন্থের অন্তর্গত হয়। এই বইটির তিনটি ভাগের দ্বিতীয় অংশে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩০৯.২.৭.২ : প্রবন্ধের বিশ্লেষণ

বুদ্ধদেব বসু সমালোচনাকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কবিদের অবস্থান নির্ণয় করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'স্বভাবকবির' স্বরূপটিও স্পষ্ট করেছিলেন। 'যাঁর মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতীন সম্বন্ধ।' আবার কেউ কেউ ঐতিহাসিক কারণেও 'স্বভাবকবি' হয়েছিলেন। রবিরাজত্বের প্রথম পর্বে তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত অনেকেই। প্রাবন্ধিকের মতে, বিশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন প্রখর তরুণ কবিরা রবিচুম্বকে আকৃষ্ট হয়েছেন সহজেই। ফলে স্বভাব কবিত্ব তাদের বিধিলিপি হয়ে গেছে। আসলে বিশ শতকের প্রথম দুটি দশকে ক্ষীণপ্রায় বাংলা সাহিত্যের অর্জন বলতে ছিল দাশরথি রায়ের চাতুরি, রামপ্রসাদের কড়াপাকের ভক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ফিটফাট সাংবাদিকতা ও মধুসূদনের তূর্যধ্বনি। তাই সেকালে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলা দেশের পক্ষে এবং বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একপ্রকার উপদ্রবের মতো। হয়তো সেই কারণেই খ্যাতির তুলনায় রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যা অল্প। প্রাবন্ধিকের মতে, রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন করার জন্য পাঠক সাধারণ দুজন লেখকের আশ্রয় নিয়েছেন। গদ্যে শরৎচন্দ্র, পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দু-দশকে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের পরিণতি কী হয়েছিল? রবীন্দ্র সমকালে লিখতে এসে এঁদের রচনা সমতলরকম সদৃশ্য, আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, কবিতে-কবিতে ভেদাভেদ চিহ্ন অস্পষ্ট। তবে এত সহজে এঁদের কাব্য প্রতিভাকে মূল্যায়ন করা ঠিক নয়। কারণ বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা এঁরা অনেকেই

লিখেছিলেন। তবুও এঁদের কাব্যলক্ষণ যে সুস্পষ্ট হল না তা দুটি কারণে। প্রথমত, তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ও অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং রবিকবির আপাত জলধর্মী সরলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ঘিরেই ঘুরতে লাগলেন। তাঁরই মধ্যে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। এককথায় রবিতাপে আত্মাহুতি দিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ যা করেননি তা করাই ছিল প্রকৃত উত্তরসাধকদের কাজ।

আসলে বুদ্ধদেবের সমালোচনায় যে জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটি হল সাহিত্যবিচারের কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড তিনি গ্রহণ করেননি। বিশ্লেষণ ও বিবেচনার মধ্য দিয়ে বারেবারে গ্রহণ ও বর্জন করেছেন। তিনি একদিকে আধুনিক কবিতার আন্দোলনে পুরোধা ব্যক্তি অন্যদিকে কবি রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিশাল ও মহৎ ভূমিকা 'যেন এক দৈব আবির্ভাব অপর্যাপ্ত, চেষ্টাহীন, ভাস্বর পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম : আমার কাছে এবং আমার মতো আরো অনেকের কাছে এ-ই হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' (রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি)

রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই মূলত প্রাবন্ধিক ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দের আলোচনা করেছেন। যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধন, কিরণধন প্রমুখের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় কারণ তিনি ছন্দোরাজ। শুধু তাই নয় সত্যেন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করে 'সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়' বলে তিনি কিছুটা ব্যঙ্গ করেছেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে সত্যেন্দ্রনাথ রচনাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের পাশে রাখলেও তাঁকে আলাদাভাবে চেনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে সত্যেন্দ্রনাথকে আর পড়ার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন তিনি। পার্থক্যটা খাঁটিত্ব প্রসঙ্গে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে জ্যেষ্ঠ কবি-অনুজ কবি-বড়ো কবি-ছোট কবির পার্থক্য নয়, অনুভূতির কৃত্রিমতা। প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পরে কবিতা লেখাটা কঠিন দূরন্ত সীমাহীন সহজ হয়ে গেছে। কারণ দান্তের মতো, গ্যেটের মতো স্বর্গ-মর্ত্য-নরকব্যাপী মহাকাব্যিক কোনও পরিকল্পনা নেই, নেই শেক্সপিয়রের মতো অমর চরিত্রের চিত্রশালা বা মিল্টনের মতো বাক্যবন্ধের বৃহ্যরচনা। বাইরে থেকে তিনি একেবারেই নিগূঢ় বা দূর্গম নন। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও বিরল, দুষ্প্রাপ্য বা বিস্ময়কর নয়। বাংলাদেশে প্রকৃতির মধ্যে দু'চোখ ভরে যা তিনি দেখেছেন তাই লিখেছেন। তাই অনুকরণকারীদের পক্ষে বিপজ্জনক উদাহরণ তিনি। তবে কি কবি রবীন্দ্রনাথের কোনও মূল্যায়ণ তিনি করেননি? রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 'মানসী' পূর্ব কবিতাগুলিকে লক্ষ্য করে কবি বলেছিলেন 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবে সেটা উপেক্ষার যোগ্য'। প্রাবন্ধিক বলেছেন, রবীন্দ্র কাব্যের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে একধরণের ছেলেমানুষি। এর অর্থ তাঁর কবিতা বাইরে থেকে সংগ্রহ করা নানারকম পদার্থের সহাবস্থান নয়, মনের কথাটির অবিরাম উচ্চারণ। এই কারণে তাঁর পরিণত কালের অনেক রচনাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীতে'র সমধর্মী। আসলে রবীন্দ্রকাব্যের গোত্র বিচার করা এককথায় অসম্ভব। চারদিকের প্রত্যক্ষ পৃথিবী দিনে দিনে যেমন করে তাঁর চোখের সামনে ধরা দিয়েছে তাকেই অক্লান্তভাবে উপস্থিত করে গেছেন কবিতার মধ্যে। এ এক আশ্চর্য রহস্য ! সমালোচনার কলকব্জায় সে রহস্য ধরা পড়ে না। মুগ্ধতাই এর একমাত্র পাঠ।

'আমার যৌবন' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ার দরকার হয়েছিল। এ কথা তাঁর একার নয়। তাঁদের কাল ও প্রজন্মের কথা। বুদ্ধদেব ভয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্র জালে আটকে পড়ার। বিষ্ণু দে'র কথায় যা 'রবীন্দ্রব্যবসা'। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায় 'পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর'। এঁদের প্রজন্মের কবিরা রবীন্দ্রনাথকে শিরোধার্য করেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ অনিবার্য জেনেই সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের অনুকৃত পথকে অস্বীকার করে নতুন পথে যাত্রা করেছেন কল্লোল যুগের কবিরা। গদ্যের ক্ষেত্রে ছবিটা একটু আলাদা। রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরপরই দু'জন রবিভক্ত অথচ মৌলিক লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু কবিতায় সেটা সম্ভব হল না যতদিন না বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে হৈ হৈ করে এসে পৌঁছলেন নজরুল ইসলাম। নজরুলকে বুদ্ধদেব ঐতিহাসিক স্বভাবকবি অভিধায় ভূষিত করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে নজরুল আগাগোড়াই প্রতিভাবান বালকের মতোই লিখে গেছেন। তাঁর কুড়ি আর চল্লিশ বছরের লেখায় খুব একটা প্রভেদ নেই। বোঝাই যায় পরিণতির দিকে তাঁর প্রবণতা কম ছিল বরং তাঁর কবিতা অসংবৃত, প্রগলভ, আন্তরিক উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। তবে রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই প্রথম খাঁটি কবি বা মৌলিক কবি। এর প্রেক্ষিত হিসাবে অবশ্য বুদ্ধদেব নজরুলের জীবনের পটভূমিকার বিচিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। যাত্রা গান লেটোগানের আসরে মফস্বলে বাল্য-কৈশোর অতিক্রান্ত করা, বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে তারপরে সৈনিক জীবন সামাজিক স্বীকৃতি না দিলেও তাঁর কবিতা লেখায় সহায়ক হয়েছে। এই কারণেই কোনও রকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না নিয়েও তিনি রবীন্দ্র সম্মোহন উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও বাংলা কবিতায় অন্য পথ সম্ভব তিনি দেখিয়ে দেওয়ার পরই অন্যান্য কবিরা সে পথে পা দিলেন। এলেন মোহিতলাল এলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাব। এঁদের প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ। আর সেই বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জীবন বাস্তবতার নিরিখে নবীনদের মনে হল তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংগ্রামের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার প্রবল চিহ্ন। তা ছাড়া মানুষের অনস্বীকার্য শরীরটাকে কবি যেন অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। হয়তো এই বিদ্রোহে কিছুটা আবিলতা ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সত্য করে পাওয়ার জন্য, বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য এর প্রয়োজন ছিল। নিজের কথা নিজের মতো বলার জন্য এ যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখলেন। 'শেষের কবিতা'-য় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম চাইব না, আতাফলের ফরমাস দেবো।" এই ঠাট্টাকেই স্লোগান ধরে নিয়ে কল্লোল গোষ্ঠীর লক্ষ্য হল রবীন্দ্রতর হওয়া। বাঙালি কবির পক্ষে বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এঁদের মধ্যে পারস্পরিক মিল না থাকলেও এঁরা একই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে আন্দোলনটি অবশ্যই প্রকৃত উত্তরসাধক হওয়ার। কেউ কেউ তাঁকে আত্মস্থ করে শক্তি পেলেন মোকাবিলা করার আবার কেউ কেউ সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে গেলেন। যেমন জীবনানন্দ দাশ। যাঁরা মুখোমুখি হলেন তাঁরা রসদ সংগ্রহ করলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভান্ডার থেকে। আধুনিক জীবনের বিশেষত বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সংশয়, ক্লান্তি, হতাশা, বিতৃষ্ণা তাঁদের কবিতার উপকরণ হিসেবে উঠে এলো। পূর্বোক্ত উল্লিখিত কবিরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক ধরণের বোঝাপড়া করে নিলেন। বিষ্ণু দে

ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য করে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রাবীন্দ্রিক বাক্য বিন্যাসকে আত্মস্থ করে চালিয়ে দিলেন সুধীন্দ্রনাথ। অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের খুব কাছে থেকেও তাঁর কবিতায় চমক লাগালেন প্রকরণগত বৈচিত্রে ও নানারকম গদ্য বিষয়ের অবতারণ করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো রবীন্দ্র কবিতা আক্ষরিক অনুকরণ করেও মৌলিক ও সার্থক কবিতা লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল' আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো' এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক আসলে দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্র-কবিতার কাছে পরবর্তী কবিরা কতটা ঋণী। সেই ঋণকে মাথায় নিয়েই উত্তরসাধকেরা নিজস্ব পরিকল্পনার রূপায়ন করেছেন।

১৯১৪ ও ১৯৩৯ দুটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকাল। এই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রাশ্রিত বাংলা কবিতার নাবালক দশার অবসান হল। প্রাবন্ধিকের মতে, ঐতিহাসিক স্বভাবকবি নজরুল থেকে এই দশার সূচনা হয়েছিল। কল্লোল যুগের কবিরা যাঁর মধ্যে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু নিজেও আছেন তাঁরা এই দশার অবসান ঘটিয়েছিলেন। এরপরে যাঁরা কবিতা লিখতে এসেছেন বা আসবেন রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁদের আর কোনও ভয় নেই। রবীন্দ্র অনতি উত্তর কবিরাই সেই অনুকরণে আত্মসমপর্ণ করে গেছেন। এইভাবেই পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের চাপে পুরানো খোসা ফেটে যায়। নতুন বীজ বা নতুন পথ বেরিয়ে পড়ে। খুব সংক্ষেপে বললে এই প্রবন্ধটি কয়েক দশকের বাংলা কবিতা চর্চার একটি রূপরেখা। রবীন্দ্রনাথ যার মধ্যমণি। বুদ্ধদেব বসু নিজে একজন কবিতা সাধক হওয়াতে রবীন্দ্র কবিতার প্রকৃত অনুধ্যান ও পরবর্তী কবিদের কাব্য স্বরূপটি গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং বাংলা কবিতার পাঠক ও কবিদের কাছে অসামান্য আলোচনাটি তুলে ধরেছেন। এজন্য তিনি প্রণম্য। তাঁর সমস্ত উক্তি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত না হলেও তাঁকে অস্বীকার কোনও অবকাশ নেই। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শিল্পিত স্ববিরোধ : প্রবন্ধের শিল্পী' প্রবন্ধে বলেছেন, "আমাদের উত্তর-কৈশোর প্রথম যৌবনে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু স্মরণীয় ছিলেন তাঁর চমকিত উক্তিতে, বিপ্লবাত্মক বচনে এবং রমণীয় স্ববিরোধিতায়।" এই প্রবন্ধেও মাইকেল মধুসূদন বা ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে তাঁর অভিমত বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের বিস্মিত করে। এমনকি জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাবও যে পরবর্তীদের উপর পড়ছে সেদিকেও তিনি সর্তক করে গেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় টেকনিকের বাড়াবাড়িকে তিনি দুর্লক্ষণ বলে মনে করেন। আসলে ভঙ্গি বা টেকনিকই প্রধান হয়ে উঠলে বোঝা যায় মনের দিক থেকে দেউলিয়া হতে দেরি নেই। কবিতা লেখা হয় কিছু বলারই জন্যে, অন্য কিছু সেখানে অপ্রধান। বাংলা সাহিত্য ও ভাষায় আদিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তিনি। যুগে যুগে বাংলা ভাষার লেখকেরা রবীন্দ্র ভাব ও ভাষার ঋণকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করে চলেছেন। এখানেই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন।

৩০৯.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধের মূল ভাববস্তু বিশ্লেষণ করো।

২. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের সমালোচক সত্তার পরিচয় দাও।

৩০৯.২.৭.৪ : গ্রন্থঋণ

১. ড. সুখেন বিশ্বাস (সম্পাদিত) : 'স্নাতকোত্তর বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধ সংকলন' : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় : কল্যাণী : প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০

২. তরুণ মুখোপাধ্যায় : 'বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে' : কলকাতা : পুস্তক বিপণি : প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৮৮

৩. ড. সৈয়দ মহম্মদ শাহেদ (সম্পাদিত) : উত্তরাধিকার : বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ : বাংলা একাডেমী : ৩৬ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : প্রকাশকাল অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৮

একক - ৮

ভূমিকা : আধুনিক বাংলা কবিতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব

বিষয় বিন্যাস

৩০৯.২.৮.১ ভূমিকা

৩০৯.২.৮.২ আবু সয়ীদ আইয়ুব(১৯০৬-১৯৮২) : জীবনকথা

৩০৯.২.৮.৩ আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রবন্ধ সাহিত্য

৩০৯.২.৮.৪ সারাংশ

৩০৯.২.৮.৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

৩০৯.২.৮.৬ প্রশ্নমালা

৩০৯.২.৮.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৩০৯.২.৮.১ ভূমিকা

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' এই একটি গ্রন্থ সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আবু সয়ীদ আইয়ুবকে সুখ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। এই বইটিতে তিনি রবীন্দ্রমানস বিবর্তনের ক্রমপরম্পরার কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বিশিষ্ট দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যপ্রেমী এবং রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলা সারস্বতসমাজে এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যস্রষ্টারূপে পরিচিতজন। তাঁর প্রজ্ঞা ও মনীষার প্রাখর্যে এই 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকাটি পরিপূর্ণ। তাই এটি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার সমগ্র রূপটিকে দেখবার পক্ষে আমাদের যে অর্থে সুবিধা হয়, সেই প্রবণতার কথাগুলির তিনি উপস্থাপন করেছেন। মানুষে মানুষে বোধের পার্থক্য হয়ে থাকে, কিন্তু সকলকে একটি তলে এনে বিচার করবার মতো বৌদ্ধিক বিকাশ সংকলকের ছিল বলেই মনে হয়। শুরুতেই তাই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন কাব্য সংকলন কাব্য সমালোচনারই অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। আধুনিকতা একটি প্রবণতা একটি বোধ একটি বিশেষ

জোর; এ'টি কোনো বিশেষ পদার্থ নয় যাকে একটি ছাপ দিয়ে বা চিহ্ন দিয়ে মার্কামারা করে দেওয়া যেতে পারে। তাই এইরকম একটি বিষয়কে বুঝতে হলে ভূমিকার প্রয়োজন বেশি থাকে। ব্যক্ত, অব্যক্তভাব, রুচি এবং প্রবণতাএই সমস্ত দিক স্পর্শ করতে পারেন; তাই আইয়ুব এই ধরনের ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি প্রেমের কথা যা আধুনিক কবিদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। সে কথাও লেখক মার্জিতভাবে উল্লেখ করেন। প্রেম প্রকৃতি মানুষ আধুনিকেরা যাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে কবিতায় স্থান করে দিয়েছেন তার কথাও লেখক বলেছেন। তিনি পরিচিত বাংলা কাব্য-সমালোচনার যথার্থ রূপকার ও সমালোচক হিসেবে। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে তিনি যে সর্বাত্মক, নির্মোহ ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তার কথা আমরা এই সূত্রে দেখে নিতে পারি।

৩০৯.২.৮.২ আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) ঃ জীবনকথা

তিনি ছিলেন লেখক ও দার্শনিক। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ওয়েলেসলি স্ট্রিটে পিতামহের বাড়িতে তাঁর জন্ম। উর্দুই ছিল তাঁর তাঁর মাতৃভাষা। 'পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থে তিনি বলেছেন,"ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' পড়ে মুগ্ধ হয়ে মূল বাংলা ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' পড়বার দুর্দম আগ্রহই আমাকে বাংলা শিখতে বাধ্য করে।" পিতা আবুল মোকারেম আববাস ছিলেন বড়লাটের করণিক। মায়ের নাম আমিনা খাতুন। শোনা যায় তাঁর পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু তবে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি গিয়েই বাংলা ভাষাশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চাই তাঁর একমাত্র পথ। বিজ্ঞানের ছাত্র থাকলেও অসুস্থতার কারণে পদার্থবিদ্যা ছেড়ে দিয়ে দর্শন বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করেন ১৯৩৩ সালে। তিনি বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ও অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেন। পেশাগত কারণে তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। এইভাবেই তৈরি হয় প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দার্শিনিক যুক্তির বৃহৎ পরিসর।

আইয়ুবের প্রথম প্রবন্ধ 'বুদ্ধি বিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায়। তিনি বলেছিলেন"খুব খেটে বাংলায় প্রথম প্রবন্ধ লিখলাম 'বুদ্ধি বিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি'।" সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মুখে প্রবন্ধটি শুনে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ প্রশংসা করেছিলেন, প্রশংসা করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্তও। ১৯৪০ সালে তিনি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখকগোষ্ঠীর সভাপতি হন। ১৯৫০ সালে তিনি বিশ্বভারতীতে গবেষণার কাজ ও অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের কন্যা ও ছাত্রী গৌরী দত্তকে বিবাহ করেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের জীবন, চিন্তা, মনন ও লেখার মধ্যে একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৮ সালে 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' বইটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যবিচার ও সমালোচনার জগতে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এটি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সমর্থন বিশেষভাবে স্মরণীয় একটি বিষয়। ১৯৭৩ সালে লিখলেন 'পান্থজনের সখা'। ১৮৮২ সালের ২১ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

৩০৯.২.৮.৩ আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রবন্ধ সাহিত্য

আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রবন্ধের প্রধান বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা। ১৯৪০ সালে তিনি 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থটি সংকলন করেন। আমরা জেনেছি তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি'। 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি 'চতুরঙ্গ' ও 'কবিতা' পত্রিকায় বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। রবীন্দ্রপ্রেমিক হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একসময় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মেলবন্ধন লক্ষ করেছিলেন তেমনি আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রসঙ্গে বলা যায় সেই ধারার একজন যথাযোগ্য উত্তরসূরি। শুধু 'নিয়মের রাজত্ব' পড়লেই টের পাওয়া যায় সে কথার। আইয়ুবের মতো সংজ্ঞানিষ্ঠ ও দার্শনিক মন সমকালে অনেক প্রাবন্ধিকের ছিল না। তাঁর শিল্পরসিকের মন ও ব্যতিক্রমী মন প্রবন্ধকে অন্যন্য করে তুলেছে।

তিনি ছিলেন বিদ্বান পণ্ডিত ও মনস্বী সমালোচক। বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্য তা মননকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। রবীন্দ্র অনুধ্যানে যে মানস নির্মিত হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা পায় আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায়। তাঁর আধুনিক কবিতা বিষয়ক আলোচনা সকলকে মুগ্ধ করেছে, রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা সকলকে বিস্মিত করেছে, সকলের সমীহ আদায় করেছে লেখকের মূল্যবান গ্রন্থগুলি। তাঁর দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সকলের প্রজ্ঞাদৃষ্টির উন্মোচনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর গদ্যের ঘরনা আমাদের সম্মুখে পৃথক মৌলিকত্ব দাবি করে। সব মিলিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব বাংলা সাহিত্যে তথা প্রবন্ধ সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

৩০৯.২.৮.৪ সারাংশ

'আধুনিক বাংলা কবিতা' একটি সংকলন গ্রন্থ। তার ভূমিকায় সংকলক যে কথা বলেছেন তাই 'ভূমিকা'য় উল্লিখিত হয়েছে। শুরুতেই আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন কোনো নির্দিষ্ট কাল ও পরিধির মধ্যে আবদ্ধ কবিতাকে ভালো বলতে গেলে সেই নির্বাচনটি কাব্যসমালোচনার অন্তর্গত বিষয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কাব্যসংকলন বা নির্বাচন কাব্যসমালোচনারই অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্গত বিষয়। এখন বিষয় হল কোন কবিতাকে আমরা ভালো বলে চিহ্নিত করতে পারি! তিনি বলেছেন বোধ এবং রুচির উপর নির্ভর করে কবিতার সার্বিক ভালত্বটি। তাই তিনি বলেছেন 'সুরুচি মানে ভাল কবিতা চিনবার শক্তি, এবং ভাল কবিতা তাই যা রুচিবানেরা বরণ করেন।'

সাধারণভাবে ভালো কবিতা মানে আমাদের সম্মুখে একটি ধারণা আছে তা অব্যক্ত বা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরের বলা যায় যা ভালো তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আবু সয়ীদ আইয়ুব এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, সক্রেটিস ন্যায় অন্যায় প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি ন্যায় বলতে কয়েকটি ঘটনার দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং অন্যায় বলতেও একটি ভাবে নিষ্পত্তি করতে কয়েকটি ঘটনার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। তেমনি হোমার, দান্তে, শেক্সপীয়র, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রমুখজনের কবিতা ভালো কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে থাকে; সেই কবিতার নিরিখে 'ভালো কবিতার'র সংজ্ঞা

নির্ণয় করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। আধুনিক সাহিত্য আলোচনায় বনেদি রুচির 'দোহাই পাড়া' ছাড়া আর অন্য কোনো গতি নেই। সেখানেও একটি সমস্যার কথা উঠে আসে—দেশভেদে রুচির ভিন্নতা আসে। রুচির উপর নির্ভর করেই চলতে গেলে স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। যেমন ড্রাইডেনের মতো কবি সমসাময়িকদের নাট্যকারদের গ্রীক ও এলিজবিথীয়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। কাউলির প্রতিপত্তি মিল্টনের থেকেও বেশি বলে তিনি মনে করতেন—এই রকম নানান বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেশভেদে এবং কালভেদে রুচির পরিবর্তন হয় এবং সেই রুচির উপরই নির্ভর করে সমালোচনা এগিয়ে গেলে পঞ্চাশ বছর পর পূর্বের 'মহৎ তুচ্ছ হয়ে যায়, তুচ্ছ মহৎ।' এই রুচির বৈষম্যের তারতম্য মানুষের দাসত্বপ্রীতি ও ফ্যাশনপ্রবণতার নামান্তর হয়ে ওঠে। সাহিত্য আলোচনা ছাড়া দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে রুচিবৈষমের মতানৈক্য পাওয়া সম্ভব; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে পৃথক ধারার মত প্রচলিত আছে। অন্যান্য শাখায় এই গরমিল হলে ভ্রান্তি দূরীকরণে বা অপসারণে আলোচনার অবকাশ থাকে কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলতে হয় আমি দান্তেকে বড়ো কবি বলেই জানি। এই রাশভারি কথার যৌক্তিকতা কতখানি তার মীমাংসা করা ভীষণ কঠিন একটি কাজ। চিত্তগত বিভাজন বাদ দিয়ে মর্মগত বিভাজনের দিকে নজর করলে কবিতা কী, বা আর্ট কী—এই বিষয়টি বুঝতে হলে তিনটি ভাগে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে—পারমার্থিক, সামাজিক ও স্বাশ্রয়ী।

পারমার্থিক অর্থাৎ পরমার্থ সম্বন্ধীয়, তাত্ত্বিক। এ সি ব্রাড্‌লি অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে কাব্যের মূল্য তার রূপের প্রকাশের মধ্যে নেই; তা সে-রূপের অতীত কোনো এক বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় নিহিত আছে। অবশ্য হেগেলের দর্শন এইকথাকেই প্রতিপাদ্য প্রমাণ করে। আর্টকে তিনি দর্শনের প্রাথমিক ও অপরিণতরূপ বলেই মনে করেন। সামাজিক আর্টের উপর মরালিটির দাবি বিংশ শতাব্দী থেকেই চলে আসছে; তবুও সমাজের উন্নতি নেই। কারণ সমাজজীবনের চাবিকাঠি আছে ধনতন্ত্রের বৈষম্যের ঘরে। সমাজকে এই ধনবণ্টন ব্যবস্থা ক্রমশ পঙ্গু করে তুলেছে। আবশ্য মার্কবাদীদের একটু ভিন্ন মত আছে, তবুও লেখক মনে করেন আর্ট শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবে 'It is society itself which under communism becomes the work of art.' স্বাশ্রয়ী শিল্প যেমন সর্বকালীন সত্য তেমনি তাকে 'স্বতন্ত্র ও স্বাংসম্পূর্ণ'ও হতে হয়। কারণ কোনো জিনিসকে বাস্তব বলা মানেই অন্যান্য জাগতিক বস্তুর সঙ্গে কতকগুলি সূত্র ধরে সাদৃশ্য নির্ণয় করে এক সূত্রে গ্রথিত করা। কিন্তু শিল্প নিজেই হয়ে ওঠে। তাকে সমান্তরাল বস্তু বা বিষয়ের দিকে তাকালে চলে না।

মোটকথা আধুনিকতার সূত্রপাত কোনখান থেকে—এই কথার মীমাংসা করা একটু কষ্টকর। অনেকে মনে করেন কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী। অনেকের কাছে আধুনিকতা হল রবীন্দ্রবিরোধিতা করা বা স্থানবিশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। তৃতীয় দশকে যে কাজ করেছিলেন নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখজন। আধুনিক বাংলা কবিতা যে আধুনিক ইংরেজি কবিতার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত ছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মধুসূদন দত্তই এই পথের পথিক। ক্লাসিক স্তরে তাঁর কাব্যকে উন্নীত করে বাংলা সাহিত্যের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। মধুকবির বিস্ময়কর অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব যা

তিনি হোমার, ভার্জিল, মিলটন, শেক্সপীয়র থেকে পেয়েছিলেন তাতে সকলের মন দুঃসাহসিক অবদান হিসেবে গ্রহণ করলে। রবীন্দ্রনাথ এসে প্রাচীন কাব্যের ধারাটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিয়ে আধুনিকতার নবজোয়ার নিয়ে আসেন। সমসায়িক য়ুরোপে, অন্তত ইংরেজি ও ফরাসী সাহিত্যে দুটি প্রভাব প্রতীকি ও সাম্যবাদী সব চেয়ে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। প্রতিকী কবিদের কবিতা রচনার ভঙ্গি ভিন্ন। শব্দচয়ন এঁদের এতো নিখুঁত এবং বাক্যনির্মাণ এতো ঘন যে, এলিয়টের মতো কবি 'Portrait of a Lady'-র মতো উপন্যাসকে কবিতায় সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। রচনাভঙ্গিতে রোম্যাণ্টিসিস্টদের সঙ্গে প্রতিকীদের বৈষয় প্রকট হলেও বিষয়ের দিক থেকে উভয়পক্ষই অন্তরাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পক্ষপাতী। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কোনো কোনো কবিতায় এই 'পলায়নী' মনোভাব কাজ করে। বিষ্ণু দে'র চিন্তা এতখানি আত্মকেন্দ্রিক নয়; কিন্তু তাঁর সমাজবোধও নেতিবাচক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত।

আমাদের দেশে যাঁরা সাম্যবাদী কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তাঁরা হলেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় যাঁদের আসন আধুনিক কবিতার ঘরে পাকা কিন্তু সিদ্ধি এখনও তেমন নিশ্চিত কিছু নয়। লেখক উল্লেখ করেছেন আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে রোম্যাণ্টিক মনোভাব অন্তর্হিত এখনও হয়নি; তবে তা অন্তর্ধানের পথে চলেছে। পুরোনো যা কিছু সব থেকে সরে আসাটাকেই আধুনিকতা মনে করা হয়।এটাই অবশ্য হাল আমলের ফ্যাসান। তবে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ প্রখ্যাত কবিরা প্রেমকে নবতর ভঙ্গিতে ও আঙ্গিকে উপস্থাপনে আগ্রহী। তাই নতুন করে প্রেমের কথা বলা না যায় তাহলে।

৩০৯.২.৮.৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

আবু সয়ীদ আইয়ুব 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে আধুনিকতা ও আধুনিক কবিদের সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা অবিস্মরণীয় দলিল হয়ে থাকবে।আবু সয়ীদ আইয়ুবের রচিত গ্রন্থগুলি তাঁর অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন হয়ে আছে। এখানে তিনি একজন দার্শনিক হয়ে, একজন কাব্যসমালোচক হয়ে যে ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন তা আধুনিকতার নিরিখে সঠিক। 'Poetry and Truth' গ্রন্থের 'Emotive Theory and I. A. Richards' শীর্ষক প্রবন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন তা বিশ্ববিখ্যাত। যদিও তিনি ইংরেজি চর্চা ছেড়ে বাংলা সাহিত্য চর্চাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন। তবুও তিনি বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে বাংলা কবিতাকে ভালোবেসে উক্ত সংকলন গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। 'পথের শেষ কোথায়' (পৃ ২১) গ্রন্থে তিনি বলেছেন "আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকাটি বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে আমার মনে বেশ কিছুটা প্রতিরোধ ছিল... তাঁদের যুক্তি ছিল যে আধুনিক কবিতার প্রথম প্রামাণিক সংকলনরূপে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বইখানির একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে; এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার ভূমিকারও।"

গ্রন্থের পাশপাশি ভূমিকাটির মূল্য সমান উন্নতমানের তা সে'টি একবার পাঠ করলেই বোধগম্য হয়। লেখক অবশ্য বিনয়ের সঙ্গে এর ত্রুটির কথা কিছু উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন প্রথমত, ভূমিকার তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে তিনটি প্রতিভূ কাব্যতত্ত্বের আলোচনা দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত ভূমিকার শেষের দিকে

কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বাঙালি কবিদের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা নিতান্তই দায়সারা গোছের হয়েছে। মার্ক্সবাদকে তিনি বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মনে করতেন তাই ভূমিকায় তিনি তাদের কথাও নিয়ে আসেন। কবিতা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচার হওয়া উচিত। আইয়ুব মনে করতেন, 'মার্ক্সবাদ চিত্ত থেকে চিত্তান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে প্রত্যক্ষ সত্য এবং বলিষ্ঠ যুক্তির জোরেই।' বুদ্ধদেব বসু 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'সকলের রুচি একরকম নয়, ব্যক্তিগত পক্ষপাতও সকলেরই আছে, তবু আমি পাঠককে অনুরোধ করি আধুনিক কবিতার কোনো-একটি বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না-ক'রে ব্যাপারটাকে সমগ্রভাবে দেখতে। কোনো-একটা 'যুগ' বা 'আন্দোলনে'র চরিত্রলক্ষণ এক কথায় ব'লে দেয়া অসম্ভব, চারিদিক দিক থেকে আলো ফেললে তবেই তার চেহারাটি ফুটে ওঠে।"

সাহিত্য বিষয়টি মানুষের বোধের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে সাহিত্য মানুষের জন্য নয় সেই সাহিত্য পৃথিবীতে স্থান পায়না। আমাদের চিত্তের বিচারবোধের উপর নির্ভর করে তার চিরন্তনতা। তাই সাহিত্য অনেক বিরোধ, অসঙ্গতি, ভালো লাগা ভালো না লাগার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। এই কারণে সাহিত্যকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম করে বাঁধতে গেলেই বাঁধে বিপত্তি। তাই তাকে তার মতন করেই ছেড়ে দিতে হয়। আধুনিক বাংলা কবিতাকে কোন কোন দিক থেকে আইয়ুব বুঝেছিলেন তার একটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি ভূমিকায় দিয়েছেন। সেই সূত্রে গ্রন্থের মধ্যে তিনি যে যে কবিদের স্থান দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুধীরকুমার চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ রায়, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্দীন, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মনীশ ঘটক, প্রমথনাথ বিশী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হুমায়ুন কবীর, বুদ্ধদেব বসু, অরুণকুমার মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ। আধুনিক বাংলা কবিতার কিছু সমস্যার কথা তিনি অন্যত্র (পথের শেষ কোথায়, পৃ ৫৩) বলেছেন, 'সমস্যাটি বিশদ ক'রে বলবার দরকার নেই। সবাই জানেন যে সাম্প্রতিক কবিতায় এসেছে গণ্ডীবদ্ধতা, কোনো-কোনো স্থলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারাবাস। কবি এবং তাঁর পাঠকের মাঝখানে অবোধ্যতা ও অবেদনীয়তার প্রাচীর উঠেছে, সে-প্রাচীরের উপর আবার ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা।' সুতরাং আধুনিক কবিতার শিল্পপ্রতিমানকে ঠিকভাবে ধরতে সক্ষম না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তাই বৃহত্তর অর্থে আধুনিক কবিতার একটি ভূমিকা তিনি রচনা করেছেন।

৩০৯.২.৮.৬ প্রশ্নমালা

ক) 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় আইয়ুব কবিতা বিচারের মাপকাঠি কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেছিলেন? সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো

খ) কবিতার মধ্যে ভালো খারাপের মান নির্ণয় কেমনভাবে করা যেতে পারে বলে আইয়ুব মনে করতেন?

গ) আধুনিক বাংলা কবিতাকে বুঝতে আইয়ুব কোন কোন মতের আশ্রয় নিয়েছেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩০৯.২.৮.৭ সহায়ক গ্রন্থ

বুদ্ধদেব বসু - আধুনিক বাংলা কবিতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব - পথের শেষ কোথায়

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - আধুনিক বাংলা কবিতা

জীবেন্দ্র সিংহ রায় - আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বিচার ও বিশ্লেষণ

তারাপদ মুখোপাধ্যায় - আধুনিক বাংলা কাব্য

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ৯

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ এবং ধর্ম-মোক্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.৩.৯.১ : ভূমিকা

৩০৯.৩.৯.২ : প্রাচ্য পাশ্চাত্যের প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ এবং ধর্ম-মোক্ষ

৩০৯.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩০৯.৩.৯.১ : ভূমিকা

বিবেকানন্দ প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সর্বোপরি সন্ন্যাসী। স্বল্পায়ু জীবন নিয়ে পৃথিবীতে এলেও দেশ ও সমাজের জন্য তিনি যা করে গেছেন তার কোনও তুলনা নেই। ১৮৬৩-১৯০২ অর্থাৎ মাত্র ৩৯ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। এরই মধ্যে বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা জন-মানসে দাগ রেখে গেছে। সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। তাঁর যে পরিচালন ক্ষমতা 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় তা স্পষ্ট হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ কিন্তু শিক্ষাজগতে তিনি বাংলা ভাষার বড় মাপের প্রাবন্ধিক।

৩০৯.৩.৯.২ : প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ এবং ধর্ম-মোক্ষ

এক

বাংলা ভাষায় মূলত তিনি চারটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন। সেগুলো যথাক্রমে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৫) ও 'ভাববার কথা' (১৯০৭)। এর মধ্যে 'ভাববার কথা' প্রবন্ধগ্রন্থটি তাঁর বিচিত্র বিষয়ক রচনার সংকলন। উল্লেখ্য, তাঁর লেখা প্রায় সমস্ত প্রবন্ধগ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময় বহু চিঠিপত্র লিখেছেন। সেগুলি 'পত্রাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন জাগে, তিনি কি শিল্পসৃজনের লক্ষ্যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন? উত্তরে বলা যায়, একদমই না। মূলত স্বদেশপ্রীতি, স্বধর্মবোধ ও স্বজাতিপ্রীতিই ছিল তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখার মূল কারণ। বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর প্রবন্ধাবলিতে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়লে অবাক হতে হয়। ভাষার ধরনটি নিশ্চিতরূপে সহজ সরল কিন্তু সেটি ওজস্বিনী। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধে ভাষা ও রচনারীতির স্বকীয়তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনে ভাষাকে তিনি গুরুগম্ভীর করেছেন, আবার কখনও তা হয়েছে হালকা লঘু চালের। কখনও তিনি তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার করেছেন, কখনও তাঁর রচনায় এসেছে অনাড়ম্বর চলিত রূপ। তবে একথা ঠিক, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সাধুরীতির চাইতে তিনি চলিত রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর হাতেই চলিত বাংলার শিল্পনৈপুণ্য ধরা পড়েছে বিশেষভাবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখা 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে তিনি লিখেছেন—

> "চলতি ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে।"

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রবন্ধে তিনি বিষয়ানুযায়ী ভাষার ব্যবহার করেছেন। কখনও বিষয় অনুসারে প্রবন্ধে এসেছে ভাবগভীরতা, আবার কখনও তা রূপ পেয়েছে বিদ্রূপ বা রঙ্গরসিকতায়। কিন্তু বারে বারে তাঁর প্রবন্ধে এসেছে ভারত নামক একটি দেশ ও ভারতবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, ঐতিহাসিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল সমস্যার কথা। এসেছে সমাধানের ইঙ্গিতও।

মূলত তাঁর যে কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ আছে তার মধ্যে গভীর মননশীলতা ও বিশ্লেষণী শক্তির স্বরূপ ধরা পড়েছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ তিনি মূলত তুলনামূলক দৃষ্টিতে রচনা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, জীবনদর্শন ইত্যাদি তুলে ধরতে তিনি বাংলা ভাষার বলিষ্ঠ রূপকে সামনে রেখেছেন। আবার 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে এসেছে ভারতের সাংস্কৃতিক গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গটি। যদিও এটি ভ্রমণকাহিনিমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ, তবুও এখানে আবেগের আতিশয্য নেই। ভাষার গাম্ভীর্য, ভাষার সহজতা, সরলতা, ভাষার রসবোধ গ্রন্থটিতে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। আসলে বিবেকানন্দের অন্তরের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল প্রাণের পরশ। তাই 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে গদ্য ভাষা যেন রূপ পেয়েছে কাব্য ভাষায়। বাংলাদেশের রূপ বর্ণনায় তিনি এবং তাঁর প্রাবন্ধিকসত্তা যেন একাকার হয়ে গেছে। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি প্রাবন্ধিকের ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রিক চেতনার ফসল। তিনি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মূল্যায়ন করেছেন। অর্থাৎ উনিশ শতকীয় যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতবর্ষে এসেছিল, তাতে তাঁর মনে হয়েছে এটি জটিলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার পরাধীন ভারতবর্ষে যারা সেই সময় শাসন করেছে তাদের প্রতি তাঁর ধারণা হয়েছিল ইংরেজদের বিদায় একদিন হবেই। অর্থাৎ তিনি বিদ্যা ও বোধের স্বাতন্ত্র্যের স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে ভারত নামক রাষ্ট্র ও তার ইতিহাসকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

এক্ষেত্রে তাঁর সহায় হয়েছে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষা। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে সেই সময়ের ভারতবর্ষের যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকুল রূপ সেটি তাঁর ভাষায় যথাযথ হয়েছে। আমরা জানি বেদের যুগ থেকেই বৃত্তি বা কর্ম অনুযায়ী ভারতীয় সমাজে একটি শ্রেণিবৈষম্য তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তিনি বিষয়টি নিয়ে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এই শ্রেণিবৈষম্যই ভারতবর্ষের অবনতির মূল কারণ। এই বৈষম্য দূর না করলে কখনওই এই দেশ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে না। এই গ্রন্থেই তিনি সদর্পে বলেছেন সেই কথাগুলি—

> "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুসজ্জা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।"

গ্রন্থটির সমস্ত প্রবন্ধই মননশীল। তিনি সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে বিষয়, সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর যে কোনও প্রবন্ধ পড়লেই আমাদের চিন্তা যুক্তি ইত্যাদি অত্যন্ত বলিষ্ঠ হয়। তথ্যজ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়। তিনি যুক্তি দিয়ে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ধর্ম, মোক্ষ, খাদ্য, পোশাক-আশাক ও জীবনচর্চা, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরীকে আমরা চলিত গদ্যরীতির সার্থক রূপকার হিসেবে মনে করি। কিন্তু ইতিহাস বলছে, বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রথম সার্থক ব্যবহার করেছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। 'বর্তমান ভারত' ছাড়া 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে দ্রুত গতির চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, মাত্র চার বছর গদ্যচর্চা করে তিনি যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তিনি যতটা না লেখক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তার অধিক তিনি সন্ন্যাসী হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন। সমসাময়িককালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন সার্থক গদ্য শিল্পী হিসাবে রচনা করেছেন 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী' ইত্যাদি। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য ভাষা চিত্ররূপময়। অন্যদিকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর 'ঠাকুমার ঝুলি' গ্রন্থে মৌখিক গদ্য রীতিকে ধরেছেন। তবে অবনীন্দ্রনাথ বা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার দু'জনেরই গদ্য ভাষা শিশু কিশোরদের জন্যই যথার্থ। কিন্তু মননশীল গদ্য বলতে আমরা বিবেকানন্দের গদ্যকেই বুঝি।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বিবেকানন্দ অনেক জায়গায়ই কলকাতার কক্‌নি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোথাওই তিনি প্রবন্ধের গাম্ভীর্যকে ভোলেননি। গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদে রয়েছে তৎসম শব্দের আধিক্য। যেমন—

> "নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণ পরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈক-জীবন-ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।"

এর পরেই কথ্য গদ্য ব্যাবহার করে তিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছেন—

> "আমরা দেখি শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নেই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!
>
> দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, 'ম্লেচ্ছ' বলি ওরাও 'কালো দাস' বলে আমাদের ঘৃণা করে।"

অনেকে বলেন বিবেকানন্দের বাংলা ভাষারীতি দ্বারা প্রমথ চৌধুরী বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ মনে করতেন, ভাষাকে ইস্পাতের মতো ব্যবহার করতে হবে। তিনি চলিত ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন, "ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে।" পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী এই ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, "আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কোলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে।"

নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় বাংলা চলিত গদ্যের অন্যতম সেরা শিল্পী বিবেকানন্দ। কারণ তার গদ্যে মনের ভাষা ও মুখের ভাষা একাকার হয়ে গেছে। তাঁর গদ্যে যে কৌতুক রসের পরিচয় পাওয়া যায় সেই কৌতুক রসের উত্তরসূরী নিঃসন্দেহে প্রমথ চৌধুরী। আবার বলা যায় বিবেকানন্দের গদ্য রীতির কৌশলকে নতুন ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী। 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য' গ্রন্থসহ সমস্ত জায়গাতেই বিবেকানন্দ গদ্য রচনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠরূপ দেখিয়েছেন। তিনি রঙ্গব্যঙ্গ বা কৌতুকের অন্তরালে গদ্য ভাষাকে বলিষ্ঠ ও স্বাভাবিক করেছেন।

দুই

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের নাম 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে মূল গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি মূলত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম ও মোক্ষ, রাজনীতি, পোশাক ও ফ্যাশন ইত্যাদির মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই বর্তমান ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজচিত্র, প্রাকৃতিক মহিমা ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলেছেন। শুরুতেই যেভাবে তিনি গদ্যভাষায় তৎকালীন ভারতের বর্ণনা দিয়েছেন এককথায় তা অনবদ্য।

"সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্বকারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্নমৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটিরকুল, ইতস্ততঃ

শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি এই আমাদের বর্তমান ভারত।

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটির, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃত্তের পার্শ্বের কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতিহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি আমাদের জন্মভূমি।"

চিরদিনই বুদ্ধিহীন মানুষেরা এই জগতকে বহির্দৃষ্টি দিয়ে দেখে। তাই পাশ্চাত্যের নগরবাসীরা আমাদের নেটিভ পাড়াগুলিকে তাদের পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করে। তাদের চোখে ভারতবর্ষ মানে রোগ-ভোগ, দাসসুলভ সহিষ্ণু জাতি—যাদের কোনও অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই। আমাদেরকে তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, মেরুদণ্ডহীন, আনন্দ-উদ্দমহীন পূতিগন্ধপূর্ণ কীটকুলের মতো মনে করে। তারা মনে করে বর্তমান ভারতের মধ্যে ভালো আর কিছুতেই নেই। অন্যদিকে প্রাচ্যের মানুষেরা তাদেরকে বলে ম্লেচ্ছ। কারণ তারা শৌচ বা আচমন কিছুই করে না। যা পায় সেটাই খায়। কোনও কিছুতেই বাছবিচার নেই। মদ খেয়ে বগল দাবায় নিয়ে ধেই ধেই করে নাচে। আসলে উভয়ই উভয়কে দেখে বহির্দৃষ্টি দিয়ে। বিবেকানন্দ এখানে লিখেছেন—

> "দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, 'ম্লেচ্ছ' বলি ওরাও 'কালো দাস' বলে আমাদের ঘৃণা করে। এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু-দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখেনি।"

তাই বিবেকানন্দ এই প্রবন্ধে বলেছেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতেরই একটি জাতীয় ভাব আছে। সেই ভাব প্রতিনিয়ত জগতের কাজ করে চলেছে। সংসার স্থিতির জন্য এটি অবশ্যই আবশ্যক। আমরা ঘরে বাইরে এত উৎপাত, দুঃখ, দারিদ্র নিয়েও বেঁচে আছি। অন্যদিকে ইউরোপীয়রাও প্রবল প্রতিপত্তি নিয়ে সর্বশক্তিমান হয়ে বিরাজ করছে। এই দুটোরই প্রয়োজন আছে এই জগতে। যেদিন এই প্রয়োজনটুকু চলে যাবে সেইদিন সেই জাতি বা ব্যক্তির বিনাশ অবশম্ভাবী।

বিবেকানন্দ বিদেশিদের সঙ্গে ভারতের তুলনা করে বলেছেন যে, বিদেশিরা যতই বলবান হোক না কেন, ভারতীয়দেরও বল আছে। তাদেরও পৃথিবীর সভ্যতায় অনেক কিছু দেওয়ার আছে। ইউরোপীয়রা যিশুকে নিয়ে মাতামাতি করে। যিশু এসে ভারতে বসেছেন বলে, 'হাঁসেন হোঁসেন' করে বেড়াচ্ছে তারা। কিন্তু বিবেকানন্দের মতে যিশু ভারতে আসেননি, কারণ তিনি নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের দেবদেবী সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন—

> "এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা-কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, মায় অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে

বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মাকালী উনি চীন, জাপান পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর মা মেরী করে ক্রিশ্চানরা পূজা করছে।"

বিবেকানন্দ সিদ্ধান্তে এসেছেন এমন কোনও গুণ নেই যা জাতি বিশেষের একার। কোনও না কোনও জাতি কোনও না কোনও গুণে সমৃদ্ধ।

তিন

পৃথিবী জুড়ে ধর্ম ও মোক্ষ নিয়ে যেন যুদ্ধ চলছে। কেউ ধর্ম ধর্ম করে জীবন কাটাচ্ছে কেউ বা মোক্ষের জন্য হা-হুতাশ করছে। বিবেকানন্দ বলছেন যে, আমাদের দেশে মোক্ষ লাভের প্রাধান্য থাকলেও বিদেশিরা ঝুঁকে রয়েছে ধর্মে। এখন প্রশ্ন ধর্ম কী? উত্তরে বলা যায়—ধর্ম হল যা ধারণ করে। এটি ক্রিয়ামূলক। ইহলোক বা পরলোকের সুখ ভোগের প্রবৃত্তি দেয় ধর্ম। অন্যদিকে মোক্ষ হল মুক্তি। সংসার, প্রকৃতি বা শরীরের বন্ধন থেকে মুক্তি। উল্লেখ্য, মোক্ষ ব্যাপারটা শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু একসময় ভারতবর্ষে ধর্ম ও মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন ব্যাস জনকাদির সঙ্গে ছিলেন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন প্রমুখ। কিন্তু বৌদ্ধরা আসার পরে মোক্ষটাই প্রধান হল। কিন্তু বিবেকানন্দ মনে করেন ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ করতে হয় তারপরে ত্যাগ। সুতরাং দেশশুদ্ধ লোক সাধু হলে দেশটি উচ্ছন্নে যাবার জোগাড় হয়। পাশাপাশি তিনি এটাও বলেছেন যে, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্যই (হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিস্টান, জৈন ইত্যাদি) রয়েছে আলাদা আলাদা আইন। আলাদা আলাদা নিয়ম। কিন্তু বৌদ্ধরা একসময় সকলকেই মুক্তি দেবে বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হিন্দুদের মতে, ধর্মের থেকে মোক্ষটা অবশ্যই বড়ো, কিন্তু আগে ধর্মটা করা চায়। ধার্মিকের লক্ষণ সব সময় কাজ করা। যে কর্মের মাধ্যমে চিত্তকে শুদ্ধিকরণ করেছে সেই ধার্মিক। কিন্তু কর্ম ব্যতিরেকে যারা দিনরাত প্রভু প্রভু করছেন, বা হরিনাম যপ করছেন তাঁরা পাচ্ছেন ঘোড়ার ডিম। যে কর্ম করে তার মধ্যে ভালো যেমন থাকে তেমনই থাকে মন্দ। ভালো আর মন্দ মিলেমিশেই জীবন। বিবেকানন্দের মতে, কর্ম না করার চেয়ে ভালো-মন্দ মিশ্রিত কর্ম করা ঢের ভালো। এখানে বিবেকানন্দের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—

"মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরম-ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃ প্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছে, কি তমঃ প্রধান হয়েছ, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়? 'ফলেন পরিচীয়তে'। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি ওশান্তভাবপ্ন মহাবীর্যের

> পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মতো হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্বলোকপূজ্য; তাঁকে কি আর 'পূজা কর' বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর, আর জগৎ অবনতমস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" ইত্যাদি।"

তিনি আরও লিখেছেন—

> "আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়?"

এরপরেই বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনায় যিশু ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবনার তুলনা করেছে। যিশু বলেছেন যে, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কর্ম বন্ধ করে দাও ইত্যাদ। অন্যদিকে রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন যে, শত্রু নাশ করে দুনিয়া ভোগ করো। আর মহা উৎসাহে কাজ করো। মজাটা হল পাশ্চাত্যের লোকে যিশুর কথাকে আমূল না দিয়ে মহাকার্যশীল হয়েছে। দ্বিগুণ উৎসাহে তারা দেশে-বিদেশে ভোগ সুখে মেতে রয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের মানুষজন পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছে। কাজকর্ম বন্ধ করে শরীরের মধ্যে যত রাজ্যের রোগ ডেকে নিয়ে আসছে। এই যে মোক্ষ মোক্ষ শব্দটি আমরা বারবার চিৎকার করছি এই মোক্ষ শব্দটিই প্রথম 'বেদ'-এ পাওয়া গেছে। বুদ্ধ বা যিশু বেদ থেকেই তা গ্রহণ করেছেন। বিবেকানন্দের মতে, জোর করে কাউকে মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক কাজ নয়। বৈদিক ধর্মে চতুর্বর্গ সাধনার কথা আছে। তা হল ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ ও কাম। শুধুমাত্র মোক্ষ লাভের কথা বলে যিশু যথাক্রমে ভারত ও প্রাচীন গ্রিস ও রোমের সর্বনাশ করেছেন—এই রকমই এই গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন বিবেকানন্দ। তাই প্রবন্ধের শেষে বিবেকানন্দের প্রশ্ন—

> "তারপর ভাগ্যফলে ইওরোপীগুলো প্রটেস্টান্ট [Protestant] হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুবর্গের সমন্বয়স্বরূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ত্রিশ ক্রোর লোক, দেরি হচ্ছে। ত্রিশ ক্রোর লোককে চেতানো কি একদিনে হয়?"

বৌদ্ধধর্মের আর বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত তো আমাদের এ সর্বনাশ কেন হল? 'কালেতে হয়' বললে কি চলে? কাল কি কার্যকারণসম্বন্ধ ছেড়ে কাজ করতে পারে?"

৩০৯.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বিবেকানন্দের প্রাবন্ধিকসত্তা বিচার করো।

২। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বিবেকানন্দ ধর্ম ও মোক্ষ সম্পর্কে যেভাবে তুলনামূলক আলোচনার বাতাবরণ তৈরি করেছেন তা বুঝিয়ে দাও।

৩০৯.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত : 'বিশ্ববিবেক'

২. প্রণবরঞ্জন ঘোষ : 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য'

৩. লোকেশ্বরানন্দ স্বামী সম্পাদিত : 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ'

৪. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'বিবেকানন্দ : চিন্তনে ও শিল্পিত ভুবনে'

৫. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্বামী বিবেকানন্দ'

একক - ১০

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্বধর্ম-জাতিধর্ম, শরীর ও জাতিতত্ত্ব এবং পোশাক-ফ্যাশন

স্বামী বিবেকানন্দ

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.৩.১০.১ : স্বধর্ম-জাতিধর্ম

৩০৯.৩.১০.২ : শরীর ও জাতিতত্ত্ব

৩০৯.৩.১০.৩ : পোশাক-ফ্যাশন

৩০৯.৩.১০.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.৩.১০.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩০৯.৩.১০.১ : স্বধর্ম-জাতিধর্ম

চার

বিবেকানন্দের মতে 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম'-ই হল সকল দেশের কল্যাণের একমাত্র উপায়। যেখানে জাতীয় ধর্মের নাশ হয়েছে সেখানেই অধঃপতন এসেছে। বৈদিক সমাজের ভিত্তি হল স্বধর্ম বা জাতীয় ধর্ম। বিবেকানন্দ এখানে জাতি বলতে বংশগত জাতির কথাই বুঝিয়েছেন। অবশ্য তিনি গুণগত জাতিকেই আদি হিসেবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু গুণ ব্যাপারটা দু'চার পুরুষের বংশগত রূপ পায়। সুতরাং জাতীয় ধর্মটা বজায় রাখলে কখনওই সেই দেশ বা জাতির পতন হবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আমাদের অধঃপতন হচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন আমাদের জাতি ধর্ম কি উচ্ছন্নে গেছে? উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন—

> "শাস্ত্র যাকে জাতীয় ধর্ম বলে সেটি আমাদের সব ক্ষেত্রেই লোপ পেয়েছে। তাই উচিত জাতীয় ধর্মের ব্যাপারটাকে আবার ফিরিয়ে আনা।"

প্রত্যেক জাতিরই একটি জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যটি সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তাই উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়লে সেই জাতির বিনাশ নিশ্চিন্ত। যুগ যুগ ধরে মহাপুরুষদের প্রতিভা বলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি-নীতির সেই উদ্দেশ্যটি সফল করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যে অধিকারগুলি জাতীয় জীবনের জন্য আবশ্যক নয় সেই অধিকারগুলির ক্ষতি হলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু জাতীয় জীবনে ঘা পড়লে তখন সেটিকে মহাবলে প্রতিঘাত করে।

এই প্রসঙ্গে তিনটি জাতির কথা উল্লেখ করেছেন বিবেকানন্দ। সেটি হল ফরাসি, ইংরেজ ও হিন্দু। ফরাসিরা সব কিছু অবাধে সইতে পারে। যেমন—অত্যাচার, করভার ইত্যাদি। কিন্তু কেউ যদি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে ওমনি তারা পাগলের মতো তাদের প্রতিঘাত করবে। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাই হল ফরাসিদের মেরুদণ্ড। অন্যদিকে ইংরেজদের আসল কথা হল ব্যবসা, বুদ্ধি, আদান-প্রদান, যথাভাগ, ন্যায়বিভাগ ইত্যাদি। তারা সমস্ত কিছু স্বীকার করবে বা মেনে নেবে ঠিকই কিন্তু কেউ যদি তাদের গাঁট থেকে অর্থ বের করতে চায়, তার হিসাব তারা চাইবে। উল্লেখ্য, একবার তাদের রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে প্রজাদের ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছিল। রাজার মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল। আবার হিন্দুদের আসল কথা হল পারমার্থিক স্বাধীনতা। সেটাকেই বলা হয় মুক্তি। হিন্দু ধর্মাবলম্বী সমস্ত মানুষেরই এটি জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য। বহু অত্যাচার-অবিচার মুখ বুজে সইলেও ওখানে হাত দিলেই সর্বনাশ। উদাহরণস্বরূপ তিনি পাঠান রাজাদের তুলনা টেনেছেন। যখনই পাঠানরা হিন্দুর ধর্মে আঘাত করেছে তখনই তারা এই দেশ থেকে সরে গেছে। বিবেকানন্দ মোগলদের কথাও এই প্রসঙ্গে এনেছেন। কারণ মোগলরাও অর্থাৎ আওরঙ্গজেব যেদিন হিন্দু ধর্মে ঘা দিয়েছেন সেই দিনই মোঘল সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে গেছে। কিন্তু তার আগে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান বা দারাসেকো কেউই হিঁদুর ধর্মে আঘাত দেয়নি। কারণ ওঁদের সকলেরই মা ছিলেন হিঁদু। এ প্রসঙ্গে ইংরেজদের কথা বলে বিবেকানন্দ বুঝিয়েছেন যে, ইংরেজদের সুদৃঢ় সিংহাসন দীর্ঘদিন অক্ষত ছিল তার কারণ তারা কখনওই হিঁদুর ধর্মে ঘা দেয়নি। বিবেকানন্দের মতে, রাক্ষসীর প্রাণপাখিটা রয়েছে ধর্মে। সেটি কখনও কেউ নাশ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়েও বেঁচে আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই 'স্বধর্ম বা জাতি ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "কথাটি তো হল সোজা; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম কর্ম সব মিথ্যা, তাহলেও কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজ বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী-কতক নানা সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ।"

বিবেকানন্দের মূল কথা হল, এই দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে দিয়েই সব হবে। ধর্ম ছাড়া সবকিছুই ঘোড়ার ডিম। কিছুই হবে না। ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ হল ধর্মবীর। তাঁরা

সমাজ বা সমাজের রীতিনীতি ইচ্ছে হলেই বদলে ফেলেন। পৃথিবীর বাকি দেশের চিত্রটা অবশ্যই অন্য। যেখানে গোটা কতক শক্তিমান পুরুষ দেশকে পরিচালন করেন। পার্লামেন্ট, সেনেট বা ভোট ব্যালটে একই কথা। আইন-কানুন, টাকা-পয়সা সবকিছুই মানুষের জন্য। বিবেকানন্দ মানুষকে বলেছেন যে, মানুষ হতে। এখানে তাঁর উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য—

> "মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও-সব বাকি আপনাআপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ি ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও। 'তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হসে তুমরোয়। এয়সী করনী কর চলো কি তুম্ হসে জগ রোয়।' যখন তুমি জন্মেছিলে, তুলসী, সকলে হাসতে লাগলো, তুমি কাঁদতে লাগলে; এখন এমন কাজ করে চল যে, তুমি হাসতে হাসতে মরবে, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে। এ পারো তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি?"

একটি কথা প্রচলিত আছে যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন যে, যে মানুষটা বলে তার শেখার কিছু নেই সে মরতে বসেছে। যে জাতটা বলে তারা সবকিছু জেনে বসে আছে সেই জাতির অবনতির দিন ক্রমশ কাছে এসে গেছে। অর্থাৎ আসলটা বাঁচিয়ে সব সময় শেখাটাই বড় কথা। নিজেদের থেকে শিখতে হবে। পাশ্চাত্য দেশের সমস্ত কিছু শিখতে হবে, নিজেদের মতো করে। এটিই 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের মূল কথা।

৩০৯.৩.১০.২ : শরীর ও জাতিতত্ত্ব

পাঁচ

'শরীর ও জাতিতত্ত্ব' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ প্রথমেই মানুষের মধ্যে তিনটি জিনিস থাকার কথা বলেছেন। তা হল শরীর, মন আর আত্মা। এর মধ্যে শরীর হল বাইরের জিনিস। প্রথমে তিনি শরীরের সঙ্গে শরীরের পার্থক্যের কথাটি তুলে ধরেছেন। পার্থক্যটা মূলত নাক-মুখের গড়ন, শরীরের দৈর্ঘ্য, গায়ের রং, চুল ইত্যাদির। গরমের দেশের মানুষের গায়ের রং সাধারণত কালো প্রকৃতির হয়। আর ঠান্ডার দেশের ফর্সা বা উজ্জ্বল। অবশ্য ব্যতিক্রমও লক্ষ্যণীয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বা একাধিক গ্রন্থ পড়ে বিবেকানন্দের এইগুলিই অনুভূতিতে এসেছে।

তাঁর মতে ভারতে বহিঃস্থিত জাতি অর্থাৎ চিন, হুন, দরদ, পহলব, যবন ও খস এগুলি হল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি। আবার হিঁদুর মধ্যে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য আছে তারাও আর্য জাতি। 'দরদ'-রা আফগানিস্তানের পাহাড়ি জাত। 'চিন' বলে এক বড় জাতি একসময় কাশ্মিরের উত্তর পূর্বভাগে ছিল। 'হুন'

নামে প্রাচীন জাতি একসময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। 'যবন' আসলে গ্রিকদের নাম। 'পহলব' শব্দে পারসি জাতিকে বোঝানো হয়েছে। 'খস' শব্দে অর্ধসভ্য পার্বত্য দেশবাসী আর্য জাতিকে বোঝানো হয়েছে।

বিবেকানন্দ আধুনিক পণ্ডিতদের ভাবনাকে সামনে রেখে বলেছেন যে, প্রকৃত আর্যদের গায়ের রং লালচে সাদা রঙের হয়ে থাকে। তাদের চুল লাল বা কালো হয়ে থাকে, নাক-চোখ সোজা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র তাদের মাথার গড়ন ও চুলের রঙে একটু প্রভেদ দেখা যায়। যেখানে আর্যদের গায়ের রং পুরোটাই কালো, সেখানে নিশ্চিতরূপে অন্যান্য কালো জাতের সঙ্গে মিশে তাদের গায়ের রংটা এরকম দাঁড়িয়েছে। হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত যে দু'চার জাতি এখনও আর্য আছে আর বাকি সবই সংকর জাতীয়। পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন, বিবেকানন্দের মতে হিঁদুরা আর্য। তারা শুদ্ধ হোক, সংকর হোক বা মিশ্র হোক এটি কথা নয়। তবে এটা ঠিক হিঁদুরা সুশ্রী সুন্দর। বিবেকানন্দের নিজের কথায়—

> "একথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বলছি না, কিন্তু একথা জগৎপ্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মতো আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, অন্যান্য দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশি; কেন না, আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। অন্য দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে বিশ্রীকে ক্রমাগত সুশ্রী করবার চেষ্টা।"

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনায় বিবেকানন্দ ওদেশের যুবক-যুবতীর প্রসঙ্গ এনেছেন। পাশ্চাত্যে চল্লিশ বছরের পুরুষকে জোয়ান বলে। আর পঞ্চাশ বছরের স্ত্রীলোক যুবতী। তারা ভালো খায়, ভালো পরে ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তারা অল্প বয়সে বিয়ে করে না। আমাদের দেশের মানুষেরা 'বল বুদ্ধি ভরসা তিন পেরুলে ফর্সা'। তার কারণ কুড়ি, পঁচিশ বা তিরিশেই তারা বিয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করে। আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বুড়ো-বুড়ি হওয়ার দিকে যাচ্ছে তখন পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েরা সবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে।

খাদ্য খাবারের তুলনা করে বিবেকানন্দ বলেছেন যে, আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই নিরামিষাশী। তাদের সিংহভাগ পেটের রোগে ভোগে। আর উদরভঙ্গে বুড়ো-বুড়িরা মরে। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের সিংহভাগ মানুষই মাংসাশী। হৃদরোগ ও ফুসফুস রোগেই মূলত বুড়ো-বুড়িরা মরে। আমাদের দেশে দাঁতের রোগ ও চুলের রোগ খুব কমই হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যে দাঁত আর চুলের গোড়ায় (টাক) রোগের ছড়াছড়ি। এদেশের মহিলারা নাক-কান ফোঁড়ে গহনা পরার জন্য। আর ওরা নাক-কান ফোঁড়ার বদলে কোমর বেঁধে বেঁধে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে পিলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে। অতঃপর শরীরটাকে বিশ্রী করে তোলে। বিবেকানন্দ এইভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শরীর ও জাতিতত্ত্বের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

৩০৯.৩.১০.৩ : পোশাক ও ফ্যাশন

ছয়

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধগ্রন্থে 'পোশাক ও ফ্যাশন' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। বিবেকানন্দ তুলনামূলক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে পোশাক ও ফ্যাশনের আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, পাশ্চাত্যের নারী পুরুষদের পোশাক, দৈনন্দিন ও অফিসের কাজ করার উপযোগী। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ধনি লোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোশাক ছাড়া সাধারণ মেয়েদের পোশাক হতচ্ছাড়া মনে হয়েছে। এদেশের মেয়েদের শাড়ি পড়াকে তিনি অতুলনীয় মনে করেছেন। পাশাপাশি পুরুষদের চোগা, চাপকান ও পাগড়িকে মনে করেছেন সৌন্দর্যের আধার। প্রাচ্যের পোশাকে প্রচুর ভাঁজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই পোশাক দৈনন্দিন বা অফিসিয়াল কাজ করার উপযুক্ত নয়। পাশ্চাত্যের নারী পুরুষের পোশাকে কোনও ভাঁজ নেই—সেগুলি আঁটোসাটো, কাজকর্মের উপযোগী। পাশ্চাত্যদের ফ্যাশন কাপড়ে আর প্রাচ্যবাসীদের ফ্যাশন গয়নায়।

এখন প্রশ্ন 'ফ্যাশন' বলতে কী বোঝায়? উত্তরে বলা যায় 'ঢঙ্'। মেয়েদের ফ্যাশনের স্বর্গ শহর প্যারিস। পুরুষদের লন্ডন। একসময় একজন নটী যে পোশাক পরত অমনি সকলে সেটা নিয়ে মেতে থাকত। এখন নতুন ফ্যাশনের পোশাক তৈরি করা প্রকাণ্ড বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "কোন্ মেয়ের গায়ের চুলের রঙের সঙ্গে কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে, কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্টা বা পরিস্ফুট করতে হবে ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোশাক তৈরি হয়। তারপর দু-চারজন উচ্চপদস্থ মহিলা যা পরেন, বাকি সকলকে তাই পরতে হয়, না পরলে জাত যায়! এর নাম ফ্যাশন! আবার এই ফ্যাশন ঘড়ি-ঘড়ি বদলাচ্ছে, বছরে চার ঋতুতে চারবার বদলাবেই তো, তা ছাড়া অন্য সময়েও আছে।"

ধনি লোকেরা দর্জি দিয়ে নিজের পছন্দ মতো পোশাক বানায়। আর মধ্যবিত্তরা কখনও নিজের হাতে ছুটকোছাটকা মেয়ে দর্জি দিয়ে পোশাক বানিয়ে নেয়। যারা ধনি তাদের পোশাক আসে প্যারিস থেকে তৈরি হয়ে। বাকিরা নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে। বিবেকানন্দ বলেছেন—

> "কিন্তু মেয়েদের টুপিটি আসল ফরাসি হওয়া চাই-ই চাই। যার তা নয় সে লেডি নয়।"

পাশ্চাত্যের ধনি মানুষেরা ফি ঋতুতে কাপড়গুলি চাকরদের দান করে দেয়। মধ্যবিত্তরা আবার সেগুলি বেচে দেয় বিভিন্ন উপনিবেশে। অর্থাৎ আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। বিবেকানন্দ লক্ষ করেছেন, ইংরেজ ও জার্মান মেয়েরা খুব একটা প্যারিস ঢঙে পোশাক পড়ে না। এই জন্যে ওদেরকে অন্যান্য দেশের মেয়েরা ঠাট্টা করে। ইংরেজ নারীদের তুলনায় পুরুষেরা ভালো পোশাক পড়ে। আর

আমেরিকান নারী-পুরুষ উভয়েই নিত্য নতুন ফ্যাশনে পোশাক পড়ে। তাদের পুরুষেরা লন্ডনের তৈরি পোশাক পরে আর মেয়েরা প্যারিসের। ঠিক ঠিক ফ্যাশনের পোশাক না পরে তারা কখনওই আমেরিকার জেন্টলম্যান বা লেডিরা রাস্তায় বের হয় না।

প্রাচ্য অর্থাৎ আমাদের দেশে ফ্যাশন বা ঢঙের ব্যাপারটা ছড়িয়ে রয়েছে পোশাকের বদলে গয়নায়। কিন্তু পাশ্চাত্যে পশম, রেশম বা তাঁতিদের নজর রয়েছে কীভাবে পাল্টাচ্ছে কতটা বদলাচ্ছে ফ্যাশন তার উপরে। অর্থাৎ নতুন ফ্যাশন অন্যদের আকর্ষণীয় করার জন্য তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। একসময় ফরাসি দেশের তৃতীয় নেপোলিয়ান সিংহাসনে আসীন ছিলেন সেইসময় সাম্রাজ্ঞী অজিনা ছিলেন পাশ্চাত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি খুব পছন্দ করতেন কাশ্মিরি শাল। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁরা ভারত থেকে শাল নিয়ে যেতেন পাশ্চাত্যে। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ানের পতনের পরই বিদেশে শাল বিক্রি বন্ধ হয়েছে। কাশ্মিরের সওদাগর ও শাল শিল্পীরা ধাক্কা খেয়েছে।

কাজকর্মের নিরিখে বিবেকানন্দ লিখেছেন যে, পাশ্চাত্যের মানুষেরা দশ চোখ, দুশো হাত দিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করছে। অন্যদিকে আমাদের দেশের মানুষেরা অনেকেই অলসে জীবন কাটাচ্ছে। বিবেকানন্দ এখানে লিখেছেন—

> "আমরা 'গোসাঁইজী যা পুঁথিতে' লেখেননি তা কখনই করব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা; খালি চিৎকার হচ্ছে; বস কোণ থেকে বেরোও না দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।"

প্রবন্ধটি বিবেকানন্দ দেবাসুরের একটি গল্প বলার মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন। দেবতারা আত্মা, ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস রাখে। আর অসুরেরা ইহলোকে, দৈহিক সুখ ভোগে। বিবেকানন্দ ভাবতে বলেছেন এইভাবে, পাশ্চাত্যের মানুষেরা অসুর বংশ নাকি প্রাচ্যের মানুষেরা দেব বংশ।

৩০৯.৩.১০.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বিবেকানন্দ কীভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 'শরীর ও জাতিতত্ত্ব'-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা ব্যাখ্যা করো।

২। 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের মূলকথা বুঝিয়ে দাও।

৩। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধগ্রন্থে 'পোশাক ও ফ্যাশন' সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করো।

৩০৯.৩.১০.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত : 'বিশ্ববিবেক'
২. প্রণবরঞ্জন ঘোষ : 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য'
৩. লোকেশ্বরানন্দ স্বামী সম্পাদিত : 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ'
৪. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'বিবেকানন্দ : চিন্তনে ও শিল্পিত ভুবনে'
৫. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্বামী বিবেকানন্দ'

একক - ১১

বিবেকানন্দের ভাবনায় পরিচ্ছন্নতা, আহার-পানীয় ও বেশভূষা

স্বামী বিবেকানন্দ

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.৩.১১.১ : পরিচ্ছন্নতা

৩০৯.৩.১১.২ : আহার-পানীয়

৩০৯.৩.১১.৩ : বেশভূষা

৩০৯.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩০৯.৩.১১.১ : পরিচ্ছন্নতা

সাত

স্বামী বিবেকানন্দ 'পরিচ্ছন্নতা' প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের ব্যবহারিত ও আচরণীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিস্তারিত বলেছেন। তিনি এখানে বলেছেন যে, মানুষের আচরণীয় শুধু বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাই নয়, অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা অত্যাবশ্যক। পরিছন্নতাই পবিত্রতা আনতে পারে। তিনি বলছেন—

> "দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁদুদের মতো সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোন জাত জলশৌচাদি করে না। তবুও পাশ্চাত্যদের চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে, কিছু বাঁচোয়া।"

পাশ্চাত্যদের মধ্যে স্নান করার প্রচলনও নেই। ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান করতে শিখেছে। যেসব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, ওখানে ওরা সপ্তাহে একদিন স্নান করে।

সেদিনই তারা ভেতরের কাপড় বা আন্ডারওয়্যার পাল্টায়। তবে যারা পয়সাওয়ালা তারা এখন অনেকেই প্রতিদিন স্নান করে। আমেরিকানরা একটু বেশি স্নান করলেও জার্মানরা কখনও-সখনও করে। অন্যদিকে ফরাসিরা স্নানই করে না। আর স্পেন-ইতালি অতি গরম দেশ হওয়া সত্ত্বেও সাত জন্মে জলস্পর্শ করে না। তাদের গায়ে এমন দুর্গন্ধ যে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায় ভূত তো ছেলেমানুষ!"

প্রাবন্ধিক একবার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস গিয়েছিলেন। সেখানে বিরাট এক হোটেলে উঠেছিলেন তিনি। খাওয়া দাওয়াও বিশাল, কিন্তু স্নানের জায়গা নেই। দুদিন সহ্য করার পর আর তিনি পারলেন না সহ্য করতে। এই হোটেল থেকে বেরিয়ে বারোটা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হলেও স্নানের জায়গা নেই কোনও হোটেলে। বাইরে আলাদা যেসব স্নানাগার আছে সেখানে চার-পাঁচ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। সেদিন বিকেলে একটি কাগজে পড়ে জানালেন যে, এক বুড়ি, স্নানের টবের মধ্যে মারা গেছেন। জন্মের মধ্যে একবার জলস্পর্শ হতেই তিনি মারা গেছেন। প্রাবন্ধিক বলছেন যে, এই কথাগুলির একটি কথাও অতিরঞ্জিত করে বলা নয়—সবই সত্যি। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাড়িতেই একটা করে স্নানের ঘর ও জলের পাইপের ব্যবস্থা আছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রাচ্যে আমরা স্নান করি অধর্মের ভয়ে, আর পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয় পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের জল ঢাললেই হল তাতে পরিচ্ছন্নতার নাম গন্ধ না থাকলেও হবে। যেখানেই হোক ডুব লাগালেই হল। পাশ্চাত্যদের তা নয়, তাদের আবার এক বস্তা কাপড় খুলতে হয়। ওদের মধ্যে আবার গা দেখানো লজ্জার, পুরুষে পুরুষে কিছু মাত্র লজ্জা পায় না কিন্তু মেয়ে ছেলের সামনে আপাদমস্ত ঢেকে থাকতে হয়। ইউরোপীয়রা বলে, 'শরীর-সম্বন্ধী সমস্ত কার্য অতি গোপনে করা উচিত।' শৌচ করা তো দূরের কথা লোকের মধ্যে থুতু ফেলা মহা অভদ্রতা, কুলিকুচি করা অতি লজ্জার ব্যাপার। তাই লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে দেয়ে মুখ মুছে বসে থাকে। আমাদের দেশে আবার দুনিয়া লোকের সামনে বসে মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, আঁচানো। প্রাবন্ধিক বলছেন যে, এটা অত্যাচার। ওইসব কাজ গোপনে করা উচিত, তবে না করাও অনুচিত।

কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলি দেশ ভেদে অনিবার্য, সেগুলি সমাজ সহ্য করে নেয়। যেমন খেতে বসে ঢেকুর তোলা। পাশ্চাত্য দেশে তা অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু খেতে খেতে রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়া দোষের নয়। কারণ ঠান্ডা দেশের মধ্যে নাক না ঝেড়ে থাকা যায় না।

আমাদের দেশে ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করা হয়, ময়লা ছুলে স্নান করতে হয়। অন্যদিকে দরজার পাশে ময়লা স্তূপ করে পচতে রেখে দিই, তবে না ছুলেই হল। একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার করি। এই পাপের সাজা পেতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় না আমাদের। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের রান্নার পরিছন্নতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> "আমাদের রান্নার মত পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মতো পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নেই। আমাদের রাধুনীর স্নান করেছে, কাপড় বদলেছে; হাঁড়িপত্র, উনুন সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে; নাকে মুখে গায়ে হাত ঠেকলে তখনি হাত ধুয়ে তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলাতি রাঁধুনির চৌদ্দপুরুষের কেউ স্নান করেনি; রাঁধতে রাঁধতে চাখছে, আবার সেই চামচে হাড়িতে ডোবাচ্ছে।
>
> রুমাল বার করে ফোৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল কাগজ ব্যবহার করে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই সেই হাতেই রাঁধতে লাগলো।"

তিনি আরও বলছেন যে, রান্নার সময় তারা ধবধবে কাপড় আর টুপি পরে। খাওয়ার পরিবেশনের সময় ও খাবার খাওয়ার সময় তার সাজসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অন্যদিকে আমাদের দেশে স্নান করা বামুন অপরিষ্কার বসনে পরিষ্কার হাঁড়িতে রান্না করে। পরিবেশনের সময় অনেক সময় হয়তো মাটি, ময়লা, গোবর আর ঝোল একাকার হয়ে তার আলাদা আস্বাদ তৈরি করে।

প্রাবন্ধিক একটা জিনিস খুব গভীরভাবে দেখাতে চেয়েছেন যে, হিন্দুদের অন্তর্দৃষ্টি। যে অন্তর্দৃষ্টি তাদের সমস্ত কাজে ছাপ ফেলে। আর বিদেশিদের রয়েছে বহির্দৃষ্টি। তাই—

> "হিঁদু ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হোক। বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর-দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ডু থাকুক না কেন! বিলাতের মেঝে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল! হিঁদুর পয়োনালী রাস্তার উপর দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতির পয়োনালী রাস্তার নিচে টাইফয়েড ফিভারের বাসা! হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।"

প্রাবন্ধিকের বক্তব্য এই যেসব কিছুই চায় ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে। পরিষ্কারও থাকতে হবে আবার সভ্যতা ভদ্রতা রাখার জন্য কিছু কাজ গোপনেও করতে হবে। পরিষ্কার স্থানে পরিষ্কার পাত্রে পরিষ্কার হয়ে খেতে হবে। এই যে এত ওলাউঠা এত মহামারী ম্যালেরিয়া এসব আমাদেরই মহা অনাচারের ফল। এইভাবেই বিবেকানন্দ 'পরিচ্ছন্নতা' প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকটি তুলনামূলক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন।

৩০৯.৩.১১.২ : আহার ও পানীয়

আট

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বিবেকানন্দের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'আহার ও পানীয়'। প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন, আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ আহার না হলে সব ইন্দ্রিয় ঠিক মতো কাজ করে না। রামানুজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলেছেন। জাতিদোষ, অর্থাৎ যেসব খাবার খেলে মনে অস্থিরতা আসে। আশ্রয়দোষ, যা দুষ্টু লোকের স্পর্শ থেকে হয়। আর নিমিত্তদোষ, অর্থাৎ ময়লা কীটদুষ্ট খাবার। ভারতবর্ষে জাতিদোষ খুব কম ছিল। আশ্রয়দোষ নিয়ে অনেক ভুলধারণা রয়েছে। বর্তমানে নিমিত্তদোষ অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। ময়রার দোকান, বাজারের খাবারের জন্যই এটা হয়।

প্রাচীন কাল থেকে একটা বিবাদ আমাদের দেশে চলছে আমিষ আর নিরামিষ খাওয়া নিয়ে। মাংস খাওয়া উপকার না অপকার? তা ছাড়া জীব হত্যা ন্যায় না অন্যায়? কারও মতে কোনও মতেই হত্যা করা উচিত নয়। অপর পক্ষের বক্তব্য হত্যা না করলে প্রাণধারণই সম্ভব নয়। হিন্দুর মতে যজ্ঞ করে মাংস খাওয়া যায়। আবার বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন মতে প্রাণি হত্যা কিছুতেই করা যাবে না। দুই পক্ষেরই নিজস্ব নানান যুক্তি রয়েছে। বিবেকানন্দের মতে, এই তর্ক অমীমাংসিত।

আবার নিরামিষভোজীদের মধ্যেও তর্ক রয়েছে। এক দলের মতে ভাত, আলু, গম, যব ইত্যাদি শর্করা উৎপাদক খাবার রোগের কারণ। ঘাস, শাক, পাতা প্রভৃতিতে শর্করা উৎপাদক পদার্থ কম বলে ওসব খেয়ে গরু, ঘোড়া সুস্থ থাকে। আবার এক পক্ষের মতে শুল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল ও দুধ দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। এখন সর্বসম্মত মত হচ্ছে পুষ্টিকর অথচ তাড়াতাড়ি হজম হয় এমন খাবার খাওয়া উচিত। প্রাবন্ধিকের মতে, ভাজা জিনিস আসলে বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ি। এই দেশে ঘি, তেল আর গরম মশলা যত কম খাওয়া যায় ততই মঙ্গল। ঘিয়ের চেয়ে মাখন তাড়াতাড়ি হজম হয়। ময়দায় কিছুই নেই। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য।

গরিবের খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে আর ধনীরা অখাদ্য খেয়ে মরে। খিদে পেলে কচুরি না খেয়ে মুড়ি খাওয়া ভালো। সস্তাও হয়, পুষ্টিকরও। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট ভালো খাদ্য। ডালের শুধু ঝোলটাই খাওয়া উচিত, বাকিটা গরুকে দেওয়া যেতে পারে। মাংস খেলে পশ্চিমি গরম মশলাগুলো বাদ দিয়ে খেতে হয়। কচি কড়াইশুঁটির ডাল খুবই সুপাচ্য ও সুস্বাদু।

বিবেকানন্দ মনে করেছেন, এখন দেশে প্রস্রাবের রোগ খুব হয়। এর অধিকাংশই অজীর্ণ, কয়েকজনের বেশি চিন্তা করে আর বাকিদের বদহজম। পেট পুরলেই খাওয়া হয় না, যতটুকু হজম হবে, ততটুকুই খাওয়া। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদহজম। খাওয়ার দিকে যেমন নজর দিতে হবে তেমনই প্রচুর হাঁটা এবং পরিশ্রম করা উচিত। ডাক্তার দেখানো আর বেশি ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। ছুটি নিয়ে বদরিকাশ্রমে

তীর্থযাত্রা করলে আর হরিদ্দার থেকে পায়ে হেঁটে আশ্রমে গেলে প্রস্রাবের রোগ আর থাকবে না। পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়িতেও যদি হেঁটে যাওয়া যায়, শরীরের পক্ষে মঙ্গল। বিবেকানন্দ প্রশ্ন রেখেছেন, যে একদমে দশ ক্রোশ হাঁটতে পারে না, সে মানুষ না কেঁচো?

তাঁর মতে, পাঁউরুটিও বিষ। খাম্বীর মিশলেই ময়দা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। একান্তই যদি খেতে হয় পুনরায় আগুনে সেঁকে খাওয়া ভালো। যে সব জিনিস মিষ্টি থেকে টকে পরিণত হয়েছে, শাস্ত্রে তা খাওয়া বারণ। শুধুমাত্র দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয় ও উত্তম জিনিস।

অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জলশুদ্ধির খুব ধুম। ফিলটার জল ছেঁকে নেয় মাত্র, আর প্লেগ, ওলাওঠা প্রভৃতি রোগের বীজ যেমন, তেমনই থাকে। বরং ফিলটারটি ওইসব জীবাণুর জন্মভূমি হয়ে যায়। দিশি তেকাঠার ওপর তিন কলসির ফিলটারটি তবু ভালো। তবে দু-তিনদিন বাদে বাদে বালি আর কয়লা বদলে দেওয়া উচিত বা পুড়িয়ে ফেলতে হয়। গঙ্গাতীরের গ্রামগুলিতে যে জলের মধ্যে একটু ফটকিরি দেওয়া হয় সেই অভ্যাসটা খুবই ভালো। ফটকিরি থিতানো জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ব্যবহার করলে কোনও সমস্যা হবে না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, যাদের হাতে টাকা আছে, তারা ছেলেমেয়েদের নিত্য কচুরি, মণ্ডা, মিঠাই খাওয়ায়। ভাত রুটি খাওয়া যেন অপমান। ইংরেজরা এত শক্তপোক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভাজাভুজি, মণ্ডা মিঠাইয়ের নামে ভয় পায়। আর আমরা গরম দেশে বাস করি অথচ লুচি, কচুরি, মিঠাই, ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা খাই। সেকেলে মানুষেরা একটানা দশ ক্রোশ হাঁটত, দু-কুড়ি কই মাছ খেয়ে নিত, একশ বছর বাঁচত। তাদের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় আসে, চশমা পরে, লুচি, কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মারা যায়। ডাক্তারগুলিও সবজান্তা, সামান্য কিছু হলেও ওষুধ দেয়। এমনকি বদ্যিরা পর্যন্ত এখন বলে না, ওষুধ খেতে হবে নাদু ক্রোশ হেঁটে এসো।

বিবেকানন্দের মতে, আমাদের ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, সুক্তো, মোচার ঘন্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াই যায়। প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন, খাবার ক্ষেত্রে ইংরেজদের নকল করে কী হবে? অত টাকাই বা কোথায় আমাদের? তার চেয়ে পূর্ব বাংলায় যথার্থ বাঙালি, উপাদেয়, পুষ্টিকর খাবার হয়, তার নকল করা ভালো। যত পশ্চিমের দিকে ঝোঁকা হবে, ততই খারাপ। আর এই কলকাতার খাবারের অনুকরণ করে গ্রাম বাংলার মুড়ি, কলাইয়ের ডাল, পোস্তবাটা, ঢাই মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদি ফেলে সভ্য হতে গিয়ে নিজেদের সর্বনাশ করছে।

সব দেশেই গরিবদের প্রধান খাদ্য ধান্য জাতীয় শস্য। পাশাপাশি শাক, তরকারি, মাছ, মাংস বিলাসের মতো খাওয়া হয়। ভারতের অন্যান্য জায়গায় অবস্থাপন্ন লোকেরা গমের রুটি ও ভাত খায়।

সাধারণ লোকেরা বজরা, মড়ুয়া, জনার, ঝিঙ্গোরা প্রভৃতি শস্যের রুটি খায়। পঞ্জাব, রাজপুতানা এমনকি দাক্ষিণাত্যেও অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরা যদি আধ সের মাংস রোজ খায়, তাহলে অন্তত এক সের রুটি তার সঙ্গে খাবেই।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, পাশ্চাত্যে গরিব দেশে বা ধনী দেশেরও গরিবদের মধ্যে রুটি আর আলুই প্রধান খাদ্য। মাংস খায় কালেভদ্রে। স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি ইত্যাদি দেশে আঙুর জন্মায় প্রচুর। আঙুর থেকে তৈরি ওয়াইনও খুব সস্তা। সেটা খেলে সেভাবে নেশাও হয় না আবার যথেষ্ট পুষ্টিকরও। রাশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকেরা মূলত 'রাই' নামক এক ধানের রুটি, শুঁটকি মাছ ও আলু খায়।

ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থাপন্ন লোকেরা ভাত রুটি কম খায় আর মাছ মাংসই খায় বেশি। তবে ওরা মাছ বা মাংস শুধু শুধুই খায়, ভাত বা রুটি সহযোগে না। এইজন্য প্রতিটি পদ খাওয়ার পর ওদের থালা বদলাতে হয়। এতে করে নানারকম জিনিস অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই হয় না। ফরাসিরা সকালে কফি খায় আর এক-আধ টুকরো রুটি মাখন। দুপুরে খায় মাছ মাংস। আর রাতে লম্বা খাওয়া। ইতালি, স্পেনও অনেকটা ওইরকম। জার্মানরা ক্রমাগতই খেতে থাকে। দিনে পাঁচ, ছ'বার। প্রতিবারই অল্পবিস্তর মাংস খায়। ইংরেজরা তিনবার খায়। সকালে অল্প। কিন্তু মাঝেমধ্যেই তারা চা বা কফি খায়। আমেরিকানরাও তিনবার খায়। তারা প্রচুর মাংস খায় সারাদিনে।

এই সব দেশেই ডিনারটাই প্রধান খাদ্য। ধনী হলে ফরাসি রাঁধুনি এবং ফরাসি চাল। প্রথমে একটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম বা কোনও চাটনি বা সবজি। এটা তারা খায় খিদেবৃদ্ধির জন্য। তারপর সুপ, তারপর একটা ফল, তারপর মাছ। এরপর মাংসের একটা তরকারি। তারপর থান-মাংস শূল্য, সঙ্গে কাঁচা সবজি। এরপর অরণ্য মাংস, মৃগপক্ষাদি। তারপর মিষ্টান্ন। শেষে কুলফি। ধনী হলে প্রতিবার থালা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে মদও বদলে যায়। শেরি, ক্ল্যারেট, শ্যামপাঁ ইত্যাদি আর মধ্যে মধ্যে মদের কুলফি একটু। থালা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচ সব বদলানো হয়। আহারান্তে ছোট ছোট গ্লাসে বিনা দুধের কফি। তারপর ধূমপান।

আর্যরা এক পিঠে বসতো আর এক পিঠে ঠেসান দিত এবং জলচৌকির ওপর থালা রেখে এক থালাতেই সব খেত। এই পদ্ধতি এখনও পঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে রয়েছে। বাঙালি, উড়ে, তেলিঙ্গি, মালাবারি প্রভৃতি মাটিতে বসেই খায়। মুসলমানরা চাদর পেতে বসে খায়। বর্মি, জাপানিরা উবু হয়ে বসে মাটিতে থালা রেখে খায়। চিনেরা চেয়ারে বসে টেবিলে কাঁটা-চামচ সহযোগে খায়। রোমান ও গ্রিকরা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর খাবার রেখে হাত দিয়ে খেত। ইউরোপীয়রা আগে চেয়ার টেবিলে হাত দিয়ে খেত, এখন কাঁটা-চামচ দিয়ে খায়। চিনেদের খাওয়াটা খুবই কসরতের কাজ।

সব জাতিরই আদিম পূর্বপুরুষরা যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে সেটাকে বহুদিন ধরে খেত। পচে গেলেও ছাড়ত না। পরে সভ্য হয়ে উঠে, চাষবাস শিখে নিয়মিত খাবার জুটলেও সেই পচা মাংস খাওয়ার অভ্যাস গেল না। এস্কিমোরা বরফে বাস করে। সেখানে একেবারেই শস্য হয় না। শুধু মাছ আর মাংস খেতে হয়। বেশ কিছুদিন তাই খেয়ে অরুচি ধরলে তারা এক টুকরো পচা মাংস খেয়ে অরুচি দূর করে। ইউরোপীয়রা এখনও বন্য পশু পাখির মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও টাঙিয়ে রেখে পচায়। দক্ষিণি বামুনের যেমন পিঁয়াজ রসুন ছাড়া খাওয়াই হয় না। সব ধর্মেই খাওয়া দাওয়ার কিছু বিধিনিষেধ আছে, শুধু খ্রিস্ট ধর্মে নেই। বৌদ্ধ জৈনরা মাছ-মাংস খায় না। জৈনরা তো মাটির নিচের আলু, মুলো ইত্যাদিও খায় না পাছে মাটি খুঁড়তে গেলে পোকা মরে যায় এই ভেবে! রাতেও তাই খায় না, যদি অন্ধকারে পোকা খেয়ে ফেলে!

ইহুদিদেরও এরকম বহু বিধিনিষেধ আছে। যে মাছে আঁশ নেই, তা খায় না। যথা নিয়মে বলি না হলে মাংস খায় না। দুধ বা দুগ্ধজাত জিনিস রান্নাঘরে ঢুকলে সব ফেলে দিতে হয়। মুসলমানরা ইহুদিদের অনেক নিয়ম মানে বটে তবে এত বাড়াবাড়ি করে না। মাছ, মাংসের সঙ্গে দুধ খায় না ঠিকই কিন্তু এত ছোঁয়াছুঁয়িও মানে না।

বাংলাদেশ থেকে নেপাল, কাশ্মির, হিমালয় এক নিয়মে চলে। কিন্তু কুমায়ুন থেকে কাশ্মির পর্যন্ত মনুর আইন বেশি চলে। এই সকল বিধিনিষেধের অধিকাংশই স্বাস্থ্যের জন্য করে থাকে তারা। তবে সব জায়গায় নিয়ম সমান নয়।

পেটে অম্লাধিক্য থাকলে দুধ একেবারে দুষ্পাচ্য। শিশু যেভাবে মাতৃস্তন্য পান করে সেইভাবে অল্পে অল্পে দুধ খাওয়া ভালো। ওতে বেশি হজম হয়। মাংসের সঙ্গে হজম করা আরও গুরুপাক। সেকালে আঁতুড় ঘর থেকে যে সব ছেলেরা বেঁচে উঠত তারা মোটামুটি সুস্থ সবল জীবন কাটাত। তাপসেঁক, দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা মা ও সন্তান উভয়ের পক্ষেই দুঃসাধ্য ছিল। এইভাবেই বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষদের মধ্যে আহার ও পানীয়ের একটা দারুণ তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

৩০৯.৩.১১.৩ : বেশভূষা

নয়

'বেশভূষা'-ই পরিচয় করিয়ে দেয় আমরা কতটা ভদ্র। সব দেশের মানুষের কাপড়-চোপড়েই ভদ্রতা বোঝা যায়। বিবেকানন্দ অর্থাৎ প্রাবন্ধিকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের জীবনযাপনে পোশাক কতটা লাজ-লজ্জাবহন করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারছে। আমাদের দেশে মানুষেরা যেমন খালি গায়ে রাস্তায় বেরোতে পারে না, ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয়রা আবার পাগড়ি মাথায় না দিয়ে কেউ রাস্তায় বের হতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে ফরাসিদের পোশাক

অন্যান্য দেশ নকল করে। এখনও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পোশাক থাকলেও যেই দেশের মানুষ দুই পয়সাওয়ালা ভদ্রলোক হয় সেই দেশীয়রা স্থানীয় পোশাকের অন্তর্ধান ঘটিয়ে ফরাসি পোশাক পরে। কাবুলি পাজামা পরে ওলন্দাজি চাষারা, ঘাগড়া পরে গ্রিকরা, তিব্বতি পোশাক পরে রুশরা। কিন্তু যখনই এরা ভদ্র হয়ে উঠতে চায় তখনই ফরাসি 'কোট-প্যান্টালুনে' তাদের দেখা যায়। পারি রাজধানী পোশাক পয়সাওয়ালা মেয়েদের পরতেই হবে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি এরা সব ধনী জাত তাদের পোশাক তাই ফরাসি নকল। তবে আজকাল পারি অপেক্ষা লন্ডনের পুরুষদের পোশাক ভদ্র গোছের। তাই "পুরুষদের পোশাক 'লন্ডন মেড' আর মেয়েদের পারিসিয়েনর নকল।" অবশ্যই যাদের পয়সা বেশি তারা দুই জায়গায় পোশাকই ব্যবহার করে। প্রাবন্ধিক আমাদের জানাচ্ছেন—

> "আমেরিকা বিদেশি আমদানি পোশাকের ওপর ভয়ানক মাসুল বসায়, সে মাসুল দিয়েও পারি-লণ্ডনের পোশাক পরতে হবে। একাজ একা আমেরিকানরা পারে আমেরিকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা!"

পোশাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন আর্য জাতির প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। প্রাচীন আর্য জাতিরা ধুতি চাদর পরত। ক্ষত্রিয়রা ইজার ও লম্বা জামা পরত লড়াইয়ের সময়। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে পাগড়ি পরত। বৌদ্ধ আমলের যে সকল ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া যায় তার সবগুলিতে মেয়ে পুরুষ উভয়ই কৌপীন পরা। বুদ্ধদেবের বাবা ও মা কৌপীন ও পাগড়ি পরে বসেছেন সিংহাসনে। সম্রাট অশোকের সভার কথা বলেছেন প্রাবন্ধিক, সেখানেও পোশাক যাই হোক না কেন পাগড়ি সবাই পরছেন। ধুতিচাদর আর্যদের চিরন্তন পোশাক। এইজন্যই কোনও ক্রিয়াকর্মের সময় অনেক দেশেই ধুতি-চাদর পরাটা আবশ্যিক মানা হয়।

প্রাচীন গ্রিক ও রোমানদের পোশাক ধুতি-চাদর, একথান বৃহৎ কাপড় ও চাদর, যার নাম 'তোগা' অপভংশে 'চোগা'। তবে কখনও কখনও পিরানও পরা হয়। যুদ্ধ সময়ের পোশাক ইজার-জামা। মেয়েদের পোশাক লম্বা চওড়া চারকোণা জামা, উত্তরখণ্ডের পাহাড়িদের কম্বল পরার মতো পোশাক। এদের পোশাক অতি সুন্দর ও সহজ। ইরানিরা কাটা কাপড় পড়া শিখেছে মনে হয় চিনদের কাছ থেকে। চিনেদের সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> "চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের সুখ স্বাচ্ছন্দতার আদিগুরু। অনাদি কাল হতে চীনে টেবিলে খায়, চেয়ারে বসে যন্ত্র তন্ত্র কত খাওয়ার জন্য, এবং কাটা পোশাক নানা রকম, ইজার-জামা টুপিটাপা পরে।"

সিকান্দার শাহ ইরান জয় করার পর ধুতি চাদর ফেলে ইজার পরা শুরু করলে তাতে স্বদেশীয় সৈন্যরা চটে গেছিল। কিন্তু সিকান্দার এমন নাছোড় যে ইজার জামা চালিয়ে গিয়েছেন চিরদিন।

গরম দেশে কৌপীন পরে লজ্জা নিবারণ করে আর পরে অলংকার। তবে ঠান্ডার দেশের শীতে জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, কম্বল পরে, ক্রমশ জামা পাজামা ইত্যাদি পরা হয়। আমাদের দেশে যেমন গয়নার ফ্যাশন বদলায় তেমনি এদেশে বদলায় কাপড়ের ফ্যাশন।

ঠান্ডার দেশে সর্বাঙ্গ ঢেকে বাইরে বেরোতে হয়। বিলেতে ঠিক ঠিক পোশাক না পরে ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না। প্রাবন্ধিক তুলনা করে দেখাচ্ছেন—

> "পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের পা দেখানো বড়ই লজ্জা , কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখানো যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখানো বড় লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটার টানার চোটে শাড়ি কোমরে ওঠেন উঠুন, তার দোষ নেই। রাজপুতনার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখানো!"

পাশ্চাত্য দেশের নর্তকী ও বেশ্যারা লোক ভুলানোর জন্য আচ্ছাদন ছাড়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে 'আদুরে গা' ভদ্রঘরের মেয়ের নর্তকী বেশ্যার সারা শরীর ঢাকা। মালাবার দেশের মানুষেরা কৌপীনের উপর বহির্বাস পরে। আর বস্ত্র নেই।

পাশ্চাত্য দেশে পুরুষরা, পুরুষের সামনে উলঙ্গ হয়। যেমন আমাদের দেশের মেয়েরা মেয়েদের সামনে হয়। কিন্তু বাইরে রাস্তাঘাটে সর্বাঙ্গ ঢাকা রাখতে হয় তাদের। এক চিন ছাড়া সব দেশেই লজ্জা বিষয়ে অদ্ভুত সব বিষয়ে দেখা যায়। কোনও বিষয়ে ভীষণ লজ্জা, আবার তার থেকেও বেশি লজ্জার বিষয়ে তাদের কোন লজ্জা নেই। চিনের মেয়ে-ছেলেরা সর্বদা আপাদমস্তক ঢাকা রাখে। তারা বড় নীতিদুরস্ত। খারাপ কথা, খারাপ চালচলন হাতেনাতে সাজা।

লজ্জা ঘৃণার বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশেভেদে মতের পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজ ও আমেরিকানদের লজ্জা শরম এক ধরনের, ফরাসিদের লজ্জা আবার অন্যরকম। জার্মানির অন্যরকম। রুশ ও রাশিয়ার লজ্জা শরম অনেকটা কাছাকাছি, তুরস্কের আরেক রকম। এইভাবে প্রতিটি ব্যাপারে, চালচলন, লাজ-লজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছেদে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। বিবেকানন্দ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয় দেশের বেশভূষার যে তুলনা করেছেন এককথায় তা অনবদ্য।

৩০৯.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'পরিচ্ছন্নতা' প্রবন্ধের মূলভাব বুঝিয়ে দাও।

২। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের 'আহার ও পানীয়' প্রবন্ধ অবলম্বনে বিবেকানন্দের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করো।

৩। বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ অবলম্বনে উভয় দেশের বেশভূষার যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা বুঝিয়ে দাও।

৩০৯.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত : 'বিশ্ববিবেক'
২. প্রণবরঞ্জন ঘোষ : 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য'
৩. লোকেশ্বরানন্দ স্বামী সম্পাদিত : 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ'
৪. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'বিবেকানন্দ : চিন্তনে ও শিল্পিত ভুবনে'
৫. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্বামী বিবেকানন্দ'

একক - ১২

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতিনীতি

স্বামী বিবেকানন্দ

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.৩.১২.১ : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের 'রীতিনীতি'

৩০৯.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩০৯.৩.১২.১ : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের 'রীতিনীতি'

দশ

এবারে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের 'রীতিনীতি' প্রবন্ধের আলোচনা। এক এক দেশের এক এক রীতিনীতি। সভ্যতা ভব্যতার কথা মাথায় রেখে তৈরি হয় রীতিনীতি। বিবেকানন্দের মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতিনীতির মধ্যে যে তুমুল পার্থক্য রয়েছে তা এখানে তুলে ধরা হল। মলমূত্রাদি ত্যাগের জন্য দেশে দেশে নানা রীতি রয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় মল-মূত্র ত্যাগ করা বড়ই লজ্জার বিষয়। সেখানে মেয়েদের সামনে মলমূত্রের নামটি পর্যন্ত করা যায় না। পায়খানায় যেতে হয় চুরি করে। পেট গরমের কথা বা পেটের অসুখের কথা মেয়েদের সামনে বলার উপায় নেই। আর মেয়েরা মল-মূত্র চেপে মরে যাবে, কিন্তু তবুও পুরুষের সামনে সে কথা বলে না।

অবশ্য ফরাসি দেশে মল-মূত্রের ব্যাপারটি আবার এতটা লজ্জাজনক নয়। মেয়েদের মলমূত্রের জায়গার পাশেই পুরুষদের জায়গা। দরজা আলাদা আলাদা হয়, আবার কখনও দরজা এক হলেও ঘর আলাদা আলাদা। রাস্তার দুই পাশের মাঝে মাঝেই রয়েছে প্রস্রাব ত্যাগ করার জায়গা। কখনও তাতে খালি পিঠ ঢাকা পড়ে, মেয়েরা দেখছে তাতে লজ্জা নেই, অনেকটা আমাদের দেশের মতো। অবশ্য মেয়েরা অনাবৃত স্থানে মূত্র ত্যাগ করে না। মলমূত্র ত্যাগের ব্যাপারে জার্মানদের লজ্জা আরও কম।

প্রাচ্যের মানুষজন সাধারণত নিরামিষভোজী, ঘাস পাতা খায়, লোটা ভরে জল খায়। পশ্চিমী চাষারা সের খানেক ছাতু খেয়ে প্রচুর জল খায়। এত জল খাওয়াতে মূত্রত্যাগ বেশি হয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> "দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, আর বাঘ-সিঙ্গির পিঁজারা তুলনা কর দিকি!"

পাশ্চাত্য দেশের খাবার-দাবার মাংসময়, এর জন্য অল্প খাবার খায়, ঠান্ডা দেশ জল ও অল্প খায়। ছোট ছোট গ্লাসে মদ খায়। ফরাসিরা জলকে বলে 'ব্যাঙের রস'। আমেরিকার গরম যেহেতু খুব বেশি, নিউ ইয়র্ক কলকাতার চেয়েও বেশি, তাই আমেরিকানরা জল খায় বেশি। আর জার্মানরা বড্ড বেশি বিয়ার পান করে।

ঠান্ডার দেশে সর্দি লাগার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাদের খেতে বসে হাঁচা বা সিকনি ঝাড়া ঘেন্নার নয়। কিন্তু তাদের কাছে ঢেকুর তোলা বড্ড বেয়াদবি। কিন্তু আমাদের দেশে মানুষ খায় বেশি তাই ঢেকুর উঠবেই।

মেয়েদের সামনে কথাবার্তা বলতে হয় বড় সাবধানে। ইংরেজি আমেরিকানরা কথাবার্তায় বড় সাবধান। মেয়েদের সামনে 'ঠ্যাং' পর্যন্ত বলার উপায় নেই। ফরাসি, জার্মান ও রুশরা আমাদের মতো মুখ খোলা, সকলের সামনে খিস্তি করে।

আবার পাশ্চাত্যবাসীরা কথায়-বার্তায় প্রাচ্যবাসীদের থেকে কতটা আলাদা তা বোঝা যায় প্রাবন্ধিকের বলা এই কথাগুলো থেকে—

> "কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে, ভায়ে বোনে বাপে তা চলেছে। বাপ মেয়ের প্রণয়ীর ভবিষ্যৎ বরের কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে। ফরাসীর মেয়ে তাই অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোটপাট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়। সেসব কথা কওয়া চলে।"

কিন্তু

> "আমাদের দেশে প্রেম-প্রণয়ের নামগন্ধটি পর্যন্ত গুরুজনের সামনে হবার জো নেই।"

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এরা আবার কেতাদুরস্ত। এদের অনেক টাকা-পয়সা। তাই ভালো পরিচ্ছন্ন পোশাক না পড়লে সমাজে যাবার উপায় নেই। উপরের কাপড়ে একটা দাগ একটা ভাঁজ থাকলে তা বড়ই মুশকিলের। মুশকিল নখের কোণে, মুখে নোংরা লেগে থাকলে। নোংরা হাতের স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করাটা

অতি অভদ্রতা বলে বিবেচিত হয়। ভদ্র সমাজে থুতু ফ্যালা, কুলকুচি করা, দাঁত খোঁটা এগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ। যেগুলির সঙ্গে প্রাচ্য দেশের কোনও মিল নেই। বরং প্রাচ্যে এগুলি লোকসম্মুখে করা হয়। তাই দেশভেদে রীতিনীতি যে বিরাট পার্থক্য সেগুলোকেই প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন যে সবই আসলে আপেক্ষিক। যেটা একদেশে করলে তেমন অপরাধযোগ্য কাজ নয়, সেটাই আবার অন্য দেশে করলে ভীষণ অপরাধের। এই প্রবন্ধ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতিনীতি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক।

এগারো

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে পরিশিষ্ট-সহ মোট উনিশটি প্রবন্ধ আছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ বিষয় অনুযায়ী উভয় দেশ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)-এর তুলনা করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই তুলনা, এই বিচার বিশ্লেষণ, এই মূল্যায়ন নিশ্চিতরূপে তাঁর চিন্তা মননের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল। বলিষ্ঠ গদ্যভাষা, তবু কী সহজ সরল তাঁর লেখনি। পড়া শুরু করলে ছাড়া যায় না। অনেক প্রবন্ধে তৎসম, কঠিন কঠিন শব্দ আছে বটে কিন্তু সেটার অর্থোদ্ধার অতি সহজেই হয়ে যায়। প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে রসগ্রহণে বাধা হয় না।

৩০৯.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতিনীতির মধ্যে যে তুমুল পার্থক্য রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করো।

৩০৯.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত : 'বিশ্ববিবেক'
২. প্রণবরঞ্জন ঘোষ : 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য'
৩. লোকেশ্বরানন্দ স্বামী সম্পাদিত : 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ'
৪. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'বিবেকানন্দ : চিন্তনে ও শিল্পিত ভুবনে'
৫. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্বামী বিবেকানন্দ'

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.৪.১৩.১ : ভূমিকা
৩০৯.৪.১৩.২ : গোপাল হালদার : জীবনী
৩০৯.৪.১৩.৩ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়
৩০৯.৪.১৩.৪ : রূপান্তরের মূলতত্ত্ব
৩০৯.৪.১৩.৫ : বিজ্ঞানের সাক্ষ্য
৩০৯.৪.১৩.৬ : ইতিহাসের সাক্ষ্য
৩০৯.৪.১৩.৭ : প্রস্তর যুগের বিবরণ
৩০৯.৪.১৩.৮ : কৃষির দান এবং ধাতুর আবিষ্কার
৩০৯.৪.১৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.৪.১৩.১ : ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে 'সংস্কৃতি' শব্দের চল বাংলায় ছিল না। তখন 'কৃষ্টি' শব্দটি কালচার শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হতো। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে গবেষণা করতে লণ্ডনে গিয়ে এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছ থেকে, মহারাষ্ট্রে 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যাপক প্রচলনের কথা জানতে পেরে দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'কৃষ্টি' শব্দটি যেহেতু কৃষিকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই কালচারের বাংলা 'কৃষ্টি'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি ছিল বরাবর। কৃষ্টির বদলে 'কালচার' অর্থে 'সংস্কৃতি'

শব্দের ব্যবহারের সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ সানন্দে গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে সংস্কৃতি শব্দের সর্বত্র এমন উদার প্রয়োগ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র গোপাল হালদার ১৯৪১ সালে একটা সম্পূর্ণ বই-ই লিখলেন 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। এরপর 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' ও 'বাঙালী সংস্কৃতি' প্রসঙ্গ সংস্কৃতি বিষয়ক এই গ্রন্থ তিনটি গত শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট দশকের শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য বিবেচিত ছিল।

গোপাল হালদারের মধ্যে স্বদেশী-চেতনার উন্মেষ ঘটে একেবারে শৈশবেই। তারপর ১৪ বছর বয়সে যোগ দেন যুগান্তর বিপ্লবী দলে। বাবার আলমারি থেকে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী পড়ে 'আনন্দমঠ'-এ বুঁদ হয়ে ডুবে গেলেও এক সময় আবিষ্কার করেন, বঙ্কিমের 'হিন্দু জাতীয়তার' বল বৃদ্ধি করছেন। গান্ধীজি নোয়াখালি গেলে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় গান্ধীবাদে প্রাথমিক আকৃষ্ট হলেও স্বরাজ সম্পর্কে গান্ধীজির অস্পষ্ট ধারণা এবং রামরাজ্যের ভাবনা গোপাল হালদারকে পরবর্তীকালে গান্ধীবাদ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সর্বোপরি সুভাষ বসু কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হলে তিনিও কংগ্রেস ত্যাগ করে সুভাষ চন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯৩৮-এ। পরবর্তীতে ১৯৪১-এ হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ করলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন গোপাল হালদার। তাঁর এই বারংবার রাজনৈতিক দর্শন পরিবর্তন, দ্বিধা ও নিষ্ক্রমণ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করেছেন অনেক লেখকই।

গোপাল হালদার মৌলিক প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি সাহিত্য-সমালোচকের দায়িত্বেও সমান সৃজনশীল ছিলেন। তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ী বিষয়ক গ্রন্থ পড়লে এ বিষয়ে তাঁর মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা'—'ইতিহাস', 'ইতিবৃত্ত' বা 'ইতিকথা' নয়। এই 'রূপরেখা' তিনি এঁকেছেন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই অভিনব ও অনন্য।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালীদের মতো গোপাল হালদার আত্মজীবনী লিখেছেন রূপনারায়নের কূলে।

৩০৯.৪.১৩.২ : গোপাল হালদার : জীবনী

'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর লেখক গোপাল হালদার ১৯০২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলা দেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদ্‌গাঁওও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সীতাকান্ত হালদার নোয়াখালি শহরে আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্রিটিশ ঘরানার উদারনীতি, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি সীতাকান্ত বাবু ছিলেন গভীর আস্থাশীল। ১৯৩২ সালে সীতাকান্ত হালদারের মৃত্যু হয়। গোপাল হালদারের স্বীকৃতি অনুযায়ী পিতাই তাঁর জীবনের 'আদর্শ'। এই 'আদর্শ মানুষের' আদলেই গোপাল হালদার তাঁর 'ভদ্রাসন' উপন্যাস মালায় 'ভাঙন', 'স্রোতের দীপ', 'উজানগঙ্গা' পর্বের জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। সীতাকান্ত

হালদারের চরিত্রের ছাপ 'ত্রিদিবা' উপন্যাসের নায়ক অমিতের পিতার চরিত্রেও লক্ষ করা যায়। গোপাল হালদার তাঁর মননের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১) পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তাই লিখেছেন —

"বাংলা দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে তাহার সংস্কৃতির শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম আমার সেই পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের চরণোদ্দেশে —"

গোপাল হালদারের মানস গঠনে তাঁর পিতার প্রভাব ছিল অনেকখানি। গোপাল হালদারের মা বিধুমুখী দেবী। তিনি ১৯৬২ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোপাল হালদারের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু বাড়ির লাগোয়া 'বঙ্গ-বিদ্যালয়ে'। সেখানে কিছুকাল পড়াশুনার পর ভর্তি হন আর. কে. জুবিলী স্কুলে। ১৯১৮ সালে জুবিলি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে গোপাল হালদার কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে —শুরু হয় হস্টেল জীবন।

এরপর ১৯১৯ সালে, কলকাতায় সতেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। এখান থেকেই গোপাল হালদারের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এই সময় গোপাল হালদার কংগ্রেস সংগঠনের ঘনিষ্ঠ হন। রাজনীতির পাশাপাশি পড়াশোনা কিন্তু ঠিকঠাক চালিয়ে যান। অগিল্‌ভি হস্টেলের বন্ধু সজনীকান্ত দাস, পরিমল রায়, বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিধর চক্রবর্তী প্রমুখের সহযোগে সাহিত্য মজলিস গড়ে তোলেন এবং সাহিত্য সাধনায় উৎসাহী হয়ে পড়েন। এ সময়ে বেশ কিছু গল্প-প্রবন্ধ 'সবুজপত্র', 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে 'সবুজপত্রে' (মাঘ ১৩২৭/৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা) পত্রাকারে লেখা 'বাঙালী যুবক ও নন-কো-অপারেশন' রচনাটি সম্ভবত গোপাল হালদারের প্রথম মুদ্রিত রচনা। যাই হোক ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেন। আইন পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্যাগোর ল অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন।

এম.এ. ও 'আইন' পাশের পর মনের মতন বৃত্তি খুঁজে না পেয়ে, গোপাল হালদার ১৯২৫ সালে, নোয়াখালি শহরে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু ওকালতি তার ভালো লাগল না। বরং নোয়াখালির কংগ্রেস নেতা ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী পরিচালিত 'দেশের বাণী'-তে যদ্দিচ্ছা কলম চালনার সুযোগ পেয়ে কিছুটা-বা স্বস্তিবোধ করলেন। লেখার গুণেই গোপাল হালদার প্রবাসী অফিস থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসী', 'ওয়েলফেয়ার' ও 'মর্ডান রিভিউ'-এর লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যান।

১৯২৬ সালে তিনি নোয়াখালি ত্যাগ করেন। আশা, কলকাতার বৃহৎ জীবনে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আড্ডায়-আসরে মুক্ত বায়ু গ্রহণ করে মনের স্বস্তি ফিরে পান। এই সালেই ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে গোপাল হালদারের 'ইস্টবেঙ্গল ডায়ালেক্‌টস্'-এর উপর গবেষণা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে পূজোর ছুটিতে গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দাদা রঙীন হালদারের সহযাত্রী হয়ে গোপাল হালদার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ তাঁর চিন্তা-ভাবনায় গভীর ছাপ

ফেলে। প্রাচীন ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই যে ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এই শ্রদ্ধা এই উপলব্ধি আজীবন তাঁর সংস্কৃতি সাধনায় জাগ্রত থেকেছে।

এরপর তিনি রাজনৈতিক জীবনে ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় তাকে দীর্ঘদিন এই কারণে জেলেও কাটাতে হয়। ১৯৩২-১৯৩৮—এই ছয় বছর তিনি কারাবাসে ছিলেন। তিনি জেলে বসেই সাহিত্যচর্চা, গবেষণা কর্ম ও মার্কসীয় মতাদর্শের চর্চায় মন প্রাণ সঁপে দেন। ১৯৪১ সালে ১লা জানুয়ারী একেবারে নতুন বছরের শুরুতে পার্টির কাছে সদস্যের আবেদন পত্র পাঠান।

১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট, একটা চিঠিতে গোপাল হালদার লিখেছিলেন, —

"এই তো এ দেহ, বরাবর অন্তত ষাট বৎসরের রুম্যাটিক allergy-র (সর্দির) সুস্থির আশ্রয়।"

আসলে তাঁর শরীরস্বাস্থ্য কোনোদিনই শক্তপোক্ত ছিল না। দীর্ঘদিন তিনি রোগ ভোগ করেন। এরপর ১৯৯৩ সালের ৪-অক্টোবর (৩ অক্টোবর, রাত ১২টা ৩৫ মি.) কলকাতার এস.এস.কে.এম হাসপাতালে গোপাল হালদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ দিন দুপুরের পর তাঁর মরদেহ ক্রিস্টোফার রোডের বাসভবন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্যদপ্তর ভূপেশ গুপ্তভবনে আনা হয়। সেখানে শিল্পী, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর শবদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বিকেলে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৩০৯.৪.১৩.৩ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়

'কৃষ্টি' শব্দটি অপেক্ষা 'সংস্কৃতি' শব্দটি কেন অধিকতর গ্রহণযোগ্য আমরা তা বুঝতে পারি। শেষ পর্যন্ত 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলায় 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু 'সংস্কৃতি' কি? কাকে বলব 'সংস্কৃতি'? এই সব বিষয়ে কোনো দুজন আলোচক বা তাত্ত্বিক সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন বা সবাই মিলে কোনো সর্ববাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। মতের বৈভিন্নের একটা কারণ মানব প্রয়াসকে দেখার দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থকে চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিকেরা কোনো সিদ্ধান্তের কি ধরনের মাত্রাভেদে গ্রহণ করেছেন, তা আমরা কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধারেই অনুধাবন করতে পারি।

১. ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এষেতাং বৈ শিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে...। শিল্পং হাস্মিন্নাধিগম্যতে ঘ এবং বেদ যদেব শিল্পানী। আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।

এই শ্লোকটিকে ক্ষিতিমোহন সেন এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

ঐতরেয় বলেন, শিল্পীরা তাদের শিল্প সৃষ্টির দ্বারাই দেবতাদের স্তব করেছেন। সৃষ্টিতে যে (এই সব শিল্প) দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে।

যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তাই ফুল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলে। (ভারতের সংস্কৃতি)

ম্যাথু আর্নল্ড 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি'র ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন—

২. 'কালচার, হুইচ্ ইজ্ দি স্টাডি অব্ পারফেক্শন, লীডস্ আস টু কন্সীড্ ট্রু হিউম্যান পারফেক্শন, ডেভেলপিং অল সাইডস্ অব্ আওয়ার হিউম্যানিটি, অ্যাজ এ জেনারেল পারফেক্শন, ডেভেলপিং অল পার্টস্ অব্ আওয়ার সোসাইটি। (কালচার অ্যাণ্ড এনার্কি)

অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে আর্নল্ডের মতে ঃ কালচার আমাদের নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। মানবতার সামগ্রিক উন্নয়নের নামই 'সংস্কৃতি'। এই উন্নয়নের সাধনা আমাদের সমাজের যাবতীয় অংশকেই উন্নীত করে।

আর্ণল্ড সোজাসুজি বলেছেন—

৩. 'দি কালচার, উই রেকমেণ্ডেড, ইজ্ এবাভ অল, অ্যাজ ইনওয়ার্ড ক্রিয়েশন।' (কালচার অ্যাণ্ড এনার্কি)

অর্থাৎ, 'সংস্কৃতি সর্বোপরি আমাদের আভ্যন্তরীণ ও মানস জগতের সৃষ্টি।'

সংস্কৃতি বিষয়ে রুশ অধ্যাপক এ. আই. আর্নল্ড-এর মত অনেক বেশি সামাজিক সম্পর্ক নির্ভর। তিনি বলেছেন—

৪. কালচার ইজ্ দি এক্সপ্রেশন অব দোজ সোস্যাল রিলেশন্স বিটুইন দি পিপ্ল দ্যাট আর ডাইরেক্টেড টু ক্রিয়েটিং, এসিমিলেটিং, প্রিজার্ভিং অ্যাণ্ড ডিজএমিনেটিং মেটিরিয়াল অ্যাণ্ড স্পিরিচ্যুয়াল ভ্যালুজ অ্যাণ্ড ইন্টারেস্টস্। ইট ইজ্ এ হিস্টোরিক্যালি ডেভেলপিং সিস্টেম অব্ স্পিরিচ্যুয়াল ভ্যালুজ অ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডার্ডস ক্রিয়েটেড বাই দি পিপ্ল, অ্যাট দি সেম্ টাইম ইট ইজ্ এ প্রসেস অব্ হিউম্যান ক্রিয়েটিভিটি কনডিশনড্ বাই দি মোড অব্ মেটিরিয়াল প্রোডাকশন, সোস্যালি সিগনিফিকেন্ট ইন ইটস্ এসেন্স, অ্যাণ্ড টেনডিং টু মাস্টারি অ্যাণ্ড অল্টারেশন অব্ দি ওয়ার্ল্ড। ইট ইজ্ এ সেন্সিটিভ ফাইন ইণ্ডিকেটর অ্যাণ্ড রেজাল্ট অব্ দি আইডিওলজিক্যাল অ্যাণ্ড মর‍্যাল ক্লাইমেট ইন্ সোসাইটি। (সূত্র ঃ কিঙ্কর মিত্র ঃ সংস্কৃতির সংগ্রাম)

সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গোপাল হালদার বলেছেন---

৫. সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম, তার জীবনযাত্রার আর্থিক সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান; তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক

চিন্তাভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া আর নানা শিল্পসৃষ্টি। সমস্ত চারুকলা ও কারুকলা এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ। (বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ)

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে গোপাল হালদার সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করেছেন

"বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাঁহারা সংস্কৃতির বিচার করেন তাঁহারা দেখিতে পান সংস্কৃতির অর্থ এই — মানুষের জীবনসংগ্রামের বা প্রকৃতির ওপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি; আর সংস্কৃতির মূল ভিত্তিটিও অত্যন্ত বাস্তব জীবিকাপ্রয়াস সহজায়ত্ত করা।" (গোপাল হালদার ঃ সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃ-২০)

রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র মধ্যে যে সীমারেখা টানতে চেয়েছেন তা ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র মধ্যে যে রকম কোনো সীমানা নেই। বরং বলা যায়, সংস্কৃতির উদার আঙ্গিনায় কৃষ্টি নিজেই একটি অংশ।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের 'পরিপ্রশ্ন' বইটি থেকে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩৮ সালে প্রদত্ত একটি সংস্কৃতি সম্পর্কিত বক্তৃতার অংশ উল্লেখ করতে পারি ঃ

৬. "যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে; আদিম খনিজ অবস্থা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়।.... আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবলমাত্র তাই নয় সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত-বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লিহিত সাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব।"

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির সীমানা বহুদূর পর্যন্ত—জীবনযাপনের সর্বত্র বিস্তৃত করে দিয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন, আমাদের যাবতীয় সৃজন প্রয়াস, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে তৈরী হয়ে যাওয়া যাবতীয় মূল্যবোধ ও সেই বোধজাত জীবন সংস্কৃতির তাৎপর্য সর্বত্র সঞ্চারমান। সংস্কৃতির সংজ্ঞা আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বদরুদ্দিন উমর বলেছেন—

৭. জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা, তার আহার, বিহার, চলাফেরা, শোক-তাপ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি তার শিক্ষা ও সাহিত্য, ভাষা, তার দিন রাত্রির হাজার কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যেই তার পরিচয়। (সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা)

১৯৭৪-এর ডাকা শহরে সংস্কৃতি বিষয়ক একটি আলোচনা চক্রে নীলিমা ইব্রাহিম বলেন—

৮. "কোনও একটা জাতির বা মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়ণই ঐ জাতির গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নামে সাধারণত অভিহিত করা হয়ে থাকে। এর দুটি ভিন্ন রূপ বা ভিন্ন চেতনা আমরা লক্ষ করি। প্রথমটি আত্মপ্রকাশ করে জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অবলম্বন করে। সংস্কৃতির দ্বিতীয় ধারায় আমরা লক্ষ করি ঐ সমাজের ব্যক্তি চেতনার সমষ্টিগতরূপকে বা তার চিন্তাসত্তার

বহিঃপ্রকাশকে। সাংস্কৃতিক চেতনা ও জীবনবোধ মানব সমাজের বাস্তব ও অন্তর্জীবনের সমষ্টিগত রূপ।

আবার সংস্কৃতি কি? এই প্রসঙ্গে সর্দার ফজলুল করিম বলেছেন--

৯. "মানুষের কর্মময় জীবনই সংস্কৃতি। কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ যে ঐতিহ্য তৈরী করে তাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।" (ঐ) (নন্দন, চৈত্র, ৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত সুনীল বসু রায়ের প্রবন্ধ)।

এই প্রসঙ্গে লেনিনের একটি উক্তি--

"নিরক্ষরতা দূর করা যথেষ্ট নয়, দরকার সোভিয়েত অর্থনীতি গড়ে তোলা, আর সে ক্ষেত্রে কেবল সাক্ষরতা দিয়েই বেশি এগোনো যাবে না। সংস্কৃতির একটি বিপুল উন্নয়ন আমাদের দরকার।" (সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৬৮)

অর্থাৎ শুধু জনশিক্ষা বা অর্থনীতিই সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতি এমন একটা জিনিস যা বিকশিত না হলে, উন্নত না হলে প্রগতি আটকে যায়, অর্থনীতির সফল রূপায়ণ সফল হয় না, স্বাক্ষরতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। লেনিন তাই মনে করতেন—সংস্কৃতি হচ্ছে মানব সমাজের সার্বিক দক্ষতা ও একটি চেতনার স্তর, যা প্রতিফলিত হয় নানান ব্যবহারিক দক্ষতা প্রকাশের মধ্যে, অর্জিত জ্ঞানে, বিদ্যায়, শিক্ষায়। এটা একটা বিশেষ বিকাশমাত্র যা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে আরো উন্নত স্তরে পৌঁছানোর জন্যে।

সংস্কৃতির তিনটি অঙ্গ :

ঘরবাড়ি, ধনদৌলত, যানবাহন বা রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানকেই শুধু সংস্কৃতি বলে না। সংস্কৃতি বলতে মানবসম্পদও, চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যানধারণা এই সবও বোঝায়। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি নিয়েই সংস্কৃতি-মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির মোট তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের অবলম্বন আছে। প্রথমত, এর মূলভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ সমূহ (material means); দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure); আর তৃতীয়ত, সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানবসম্পদ। সেই মানব সম্পদ এই হিসাবে সমাজসৌধের 'শিখরচূড়া' মাত্র (Superstructure), সহজ কথায় উপরতলার উপকরণ। তা হলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড়জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাও তেমনি আর একটি অর্ধ সত্য। আসলে, সংস্কৃতি সমাজদেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়, তার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়েই সংস্কৃতির পরিচয়।

সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব : বাস্তব উপকরণ

আমাদের তুলনায় নিশ্চয়ই সেই প্রস্তর যুগের বা তাম্র-প্রস্তর যুগের বা লৌহযুগের মানুষ ছিল 'অসভ্য'। কিন্তু জীবিকার উপাদান তবু তারা আয়ত্ব করছে। পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সূত্রে ভাবভঙ্গি ছাড়াও অন্যরূপ প্রণালী (কণ্ঠধ্বনি) আয়ত্ব করে ফেলেছে, বিশেষ বিশেষ অর্থে একএকটা শব্দকে প্রয়োগ

করে 'ভাষা' নামক অদ্ভুত মানসসম্পদেরও অধিকারী হয়েছে। এককথায়, এই দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতির বলে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গণনায় তাই তাদেরও 'সভ্যতার' নাম আছে; উৎপাদনের উপাদান দিয়েই সেই নাম স্থিরীকৃত হয়। কারণ এদের সভ্যতার সাক্ষ্য, এদের বিচারের উপাদান — এদের ব্যবহৃত দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, আহার্য ও পানীয়-পাত্র, এদের শব-সৎকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এইসব বস্তুরই আমরা সন্ধান পাই, এখনো অন্য উপায়ে এদের কথা জানার পথ নেই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রামাণিক রূপও (টাইপ) চিনতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে একই কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরণের (টাইপের) উপকরণ মেলে তার একযোগে তাঁরা নাম দেন সেই 'কালচার' বলে। যেমন সোয়ান নদীর উপত্যকার 'সোয়ান্ কালচার'—পাথরের একটা বিশেষ ধরণের কৃতি তাতে দেখা যায়।

এই সব বাস্তব উপকরণ থেকে আবার এদের সামাজিক বা মানসিক গঠনেরও একটা আভাস আমরা লাভ করতে পারি। আহার, শিকার প্রভৃতি একই উদ্দেশ্য সাধনে নানা উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু উপকরণের নির্মাণে ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক ঐতিহ্যও হয়তো এক একটি অঞ্চলে গড়ে ওঠে। তার অনুসরণ করেই সেই বিশিষ্ট 'টাইপের' ছবি, কুঠার, বাসগৃহ, সমাধিস্থল প্রভৃতি নির্মাণ চলে। সেই সামাজিক ঐতিহ্যের আভাসও তাই উপকরণে নিহিত থাকে। আল্‌তিমারা ও দর্দঞ্জর গুহাচিত্র এই কারণেই এত গবেষণার বস্তু। কারণ, মানুষ ও তার জীবিকার উপকরণ, এই দুই যেমন মানুষের সমস্ত ইতিহাসের গোড়ার বস্তু, তেমনি সে উপকরণের প্রয়োগ সৌকর্যের জন্য মানুষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে জীবিকার দায়ে মানুষে মানুষে সে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথ-বিন্যাস গঠন করে চলে—তারই নাম সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর জীবনযাত্রার পরস্পরের সম্পর্ক দিয়েই সমাজের মুখ্য পরিচয়; ধর্ম, জাতি এই সব দিয়ে সমাজের নামকরণ এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক এবং বিভ্রান্তিকর।

দ্বিতীয় অবয়ব : সামাজিক রূপ

এবার প্রশ্ন হল উপকরণ থেকে না হয় উৎপাদন প্রথা অনুমান করা গেল, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অনুমান করা গেল, কিন্তু তা থেকে সেই সমাজের মানুষের মনের হিসাব পাওয়া যাবে কি করে? এর উত্তর, মানুষের মানসিক সৃষ্টি যেখানে পাই না, সেখানেও মানুষের মানসিক গঠনের কিছু পরিচয় তার জীবনযাত্রার উপকরণ থেকে সংগ্রহ করতে পারি। যেমন, যে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার করে খেত, তারা দল বেঁধে দুর্বল বা বৃদ্ধ পশুকে তাড়া করত, তারা সকলে মিলে দল বেঁধে খেত, শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত। এদের মনে ক্ষিদে, পশু, শিকার, দল—এই সবই ছিল প্রধান কথা। কিন্তু যে মানুষ কৃষিকর্ম আবিষ্কার করেছে তার মনে নদী, মেঘ, ঋতু, জমির মালিকানা এ সব চিন্তাই প্রাধান্য পাবে। মানুষের মানসিক গঠনের অবশ্য আরো বেশি পরিচয় সংগ্রহ করতে পারি, তার সামাজিক ব্যবস্থা থেকে—তার পরস্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচার-বিচার, উৎসব অনুষ্ঠান জানলে।

যে মানবসম্পদকে আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলে থাকি, দর্শন, কাব্য, চিন্তা, বিজ্ঞান প্রভৃতি—সে যুগে মানুষের সে সব রূপের খোঁজ পাইনা সেখানেও তার সংস্কৃতির স্বরূপ অনুমান করতে পারি—প্রথমত,

সে যুগের জীবনযাত্রার উপকরণ থেকে, দ্বিতীয়ত, তার সামাজিক রূপ থেকে। কোনো যুগে জীবনযাত্রা কি —কি প্রধান উপকরণ দিয়ে নির্বাহ হত, তা জানলে আমরা বুঝতে পারি, সে যুগের সংস্কৃতি কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল। জীবনযাত্রার উপকরণ দিয়ে এই পথে প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অনুমান করতে পারি, কতকটা মানসিক ভাবনা-ধারণারও পরিচয় পাই। যেমন, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নব্যপ্রস্তর যুগের (নিয়েন্ডারথাল) মানুষও মৃত সন্তান ও আত্মীয়বর্গের সমাধির মধ্যে খাদ্য-পানীয় রাখত। তাতে বুঝতে পারি 'মানুষ মরে না', 'অমর'—এ রকম একটা ধারণা সেই পঞ্চাশ হাজার বছরের আগেকার মানুষের মনেও জন্মেছে। শুধু তা নয়, লাখখানেক বছর আগেকার মানুষ তার পাথরের অস্ত্রশস্ত্রকে এমন করে সযত্নে পালিশ করত, যে তা দেখে বোঝা যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, নিজের মনেও জিনিসটি সুন্দর করবার প্রয়োজন সে অনুভব করতো। তারপর দেহসজ্জা, প্রসাধন প্রভৃতি উপকরণ দেখে 'অসভ্য' মানুষের এই মানসিক ভাবনা-ধারণার রুচি-রীতির অনেক হদিসই পাওয়া যায়। কিন্তু উপাদানের চাইতেও মানুষের মানসিক গঠনের স্থিরতর পরিচয় পাই সামাজিক রূপে সে যুগে এসে সংস্কৃতির এরকম ঐতিহাসিক উপাদান মেলে, অর্থাৎ যে যুগে সমাজব্যবস্থা জানা যায়, সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধু মাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়ে সভ্যতার নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। সেখানে সমাজের সেই বিশেষ রূপ দিয়েই সেই সংস্কৃতিরও নামকরণ করা আরম্ভ হয়। যেমন, পশুচারিক (Pastoral) সভ্যতা, কৃষিমূলক (Agricultural) সভ্যতা। অবশ্য এই সব সভ্যতার বা সংস্কৃতিরও আরো স্তর বিভাগ করতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই আবার নূতন নূতন স্তর ক্রমশ দেখা দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির দ্বারা সেই সব স্তর বিভক্ত। সেই স্তর-ভেদের মূলেও আছে জীবিকার্জনের নূতন প্রয়োজনের চিরন্তন তাগিদ।

শেষ অবয়ব : মানব সম্পদ

যেখানে থেকে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সুলভ, সেখান থেকে সংস্কৃতির মানব-সম্পদেরও আমরা প্রায়ই সন্ধান পাই। আচার-অনুষ্ঠানের বোঝা বয়ে কখনো চিত্র, কখনো গান, কখনো কোনো মূর্তি বা বিগ্রহ আমাদের সামনে সেই সব যুগের মানস ইতিহাস খুলে দেয়। নিজেদের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি-সম্পদের বিচারে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাসকে আমরা বড় মনে করি না বটে, কিন্তু যখন এই সব প্রাচীন বা আদিম জাতির এই গীত, নৃত্যের বা চিত্রের হিসেব নিই, তখন আমরা উপলব্ধি করি, সেই সব মানবসম্পদ তাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকাপ্রণালীর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পশুচারীর গান, নাচ বা কৃষিজীবির গান, নাচ, তার পশুপালন বা তার কৃষিকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা, এরূপ জীবিকা—প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবেই রচিত হয়েছে। ঐ সব মানস প্রয়াসে তখনকার জীবিকা প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হয়েছে, সংস্কৃতি পূর্ণতর হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গোপাল হালদার (১৯২০-১৯৯৩) বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেই পরিচিত। 'একদা', 'আর একদিন', 'স্রোতের দ্বীপ' প্রভৃতি মননশীল উপন্যাসগুলি তাঁরই লেখনী প্রসূত। তাঁর উপন্যাসগুলির মতো প্রবন্ধগুলিও যেমন কলাকৌশলের দিক থেকে স্বতন্ত্র। তেমনই

স্বতন্ত্র তাদের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও চিন্তার প্রগাঢ়তার দিক থেকে। তিনি ছিলেন ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের অন্যতম কর্মী এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তন্নিষ্ঠ সভ্য। গোপাল হালদার 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা করেন দীর্ঘদিন। তাঁর প্রবন্ধগুলি তথ্য, বিশ্লেষণ ও মনীষায় সমৃদ্ধ। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১) বাংলা চিন্তাশীল সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, ন্যাৎসী বাহিনী তখন মস্কোর দুয়ারে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তখন অনেকেরই নিকট মনে হয়েছিল অনিশ্চিত। বিশ্ব সংকটের সেই বিশেষ মুহূর্তে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির মূল পরিচয় উদঘাটনই এই গ্রন্থের উপজীব্য। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষীয় সমাজে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির রূপান্তরের মূলতত্ত্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি।

আলোচ্য প্রসঙ্গের সূচনাতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, সংস্কৃতির অর্থ সম্পর্কে। সংস্কৃতির অর্থ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই পৃথিবীতে মানুষের ছাড়া অন্য কোনো জীবকুলের সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে মানুষের যে আসল পরিচয় সেটাই সংস্কৃতি। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ তার বুদ্ধি এবং শক্তির জোরে প্রকৃতিকে অনুকূল করেছে, বোঝাপড়া করে টিকে থাকার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করেছে—প্রাবন্ধিক মানুষের এই 'কৃতি' কেই সংস্কৃতি বলেছেন। প্রকৃতির অন্ধদাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচার প্রচেষ্টায় জীবিকা আয়ত্ব করেছে, প্রয়াস প্রযত্নে আয়ত্ব করা জীবিকার সাহায্যে মানুষ অন্য জীব থেকে উন্নত হয়েছে, স্বাতন্ত্র লাভ করেছে। প্রাবন্ধিকের মতে জীবিকাপ্রয়াস ও শ্রমশক্তির মধ্যে দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির সহযোগে মানব প্রকৃতির এই স্বরাজ—সাধনাই হল সংস্কৃতি এবং এটাই সংস্কৃতির মূল কথা।

প্রবন্ধ লেখক গোপাল হালদার জানিয়েছেন, সংস্কৃতি বলতে সাধারণ মানুষের প্রচলিত ধারণার কথা, সাধারণ মানুষ সংস্কৃতি বলতে কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, আচার-বিচার এবং বিজ্ঞানকেই বোঝে। তিনি এও জানিয়েছেন, সংস্কৃতি কখনো কালগত হয়, আবার কখনো দেশগত, আবার সম্প্রদায়গত, ধর্ম ও জাতিগতও হয়। কিন্তু এ সবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক ধারণা বা জ্ঞান জন্মায় না। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতির অর্থসম্পর্কে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন —

"মানুষের জীবন — সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর

অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি।"

প্রাবন্ধিকের মতে সংস্কৃতি মনের বিলাস মাত্র নয়, মনের সৃষ্টি সম্পত্তি নয়। এই সংস্কৃতি একান্তভাবেই বাস্তব প্রয়োজনে সৃষ্টি, এবং মানুষের জীবন সংগ্রামে তা শক্তি জোগায়। সেই সঙ্গে বাস্তব উদ্দেশ্যকেও সিদ্ধ করে। আর সেই জীবনযাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতেই সংস্কৃতির রূপ ও রং পরিবর্তিত হয়। জীবন যাত্রার সঙ্গে তাল রেখে সংস্কৃতি নতুন হয়ে ওঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্বন্ধই প্রমাণ করে সংস্কৃতি নিশ্চল নয়, সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে।

৩০৯.৪.১৩.৪ : রূপান্তরের মূলতত্ত্ব

সমস্ত পরিবর্তনের মূলতত্ত্বটি আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ, সমাজ পরিবর্তন হয় ও সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয় এই সত্যও মানলাম। কিন্তু কোন্ নিয়মে এবং কেন এই পরিবর্তন ঘটে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। মানব সমাজের পরিবর্তন ঘটেছিল আদিমকাল থেকে। তাই সংস্কৃতির পরবর্তী রূপান্তর কোনো বিশেষ চেষ্টা সার্থক করবে না, তা নিস্ফল করবে তা বুঝতে প্রয়োজন রূপান্তরের তত্ত্বের। আমরা যদি এই সত্য না বুঝি তাহলে বুঝতে পারব না সোভিয়েত প্রয়াস কেন সার্থক হয় এবং ফ্যাসিস্ত প্রয়াস কেন ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়া-আফ্রিকা জাতিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে আর্থিক স্বাধীনতার বুনিয়াদ গড়তে চাইছে। আবার কেনই বা সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধের আয়োজন করতে চলেছে।

এই সব কথাই পরিষ্কার হয়ে যায়, সভ্যতার রূপান্তরের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করলে। মূলতত্ত্ব নিয়ে বিচার ও বিতর্কের অন্ত নেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব প্রমাণিত।

৩০৯.৪.১৩.৫ : বিজ্ঞানের সাক্ষ্য

মানুষের সামাজিক জীবন এবং তার যা অন্তর্জগত এ সমস্তই বাস্তব নিয়ম মেনে চলে তা আধ্যাত্মিক নয়। প্রকৃতিতে বস্তুই প্রধান জিনিস, আর মানুষ এবং পৃথিবীও বাস্তব। বস্তুপ্রকৃতি জড় নয়, চঞ্চল, পরিবর্তনশীল এবং নতুন নতুন আবির্ভাবের উৎস। বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক সন্ধানে অথবা আবিষ্কারে বিশ্ব প্রকৃতির মূল উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, মিসোট্রন ইত্যাদি। এই সমস্ত পদার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সৃষ্টি হয় নতুন বস্তু। যেমন হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের দ্বন্দ্বে সৃষ্টি হয় জল—যা সম্পূর্ণ নতুন বস্তু। বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে এই সমস্ত বস্তু পুরাতন হতে নতুন, বা নতুন হতে নতুনতর ধাপে উত্তীর্ণ হয় আকস্মিক রূপে, একটু বড় রকমের বাধা ডিঙিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক উৎক্রান্তিতে। প্রাবন্ধিক মানব সমাজের এই উৎক্রান্তিকেই বিপ্লব বলেছেন। এর ফলেই সকল বিরোধের সাময়িক অবসান হয়ে নতুনের আবির্ভাব ঘটে এবং নতুনের বুক ফেটে নতুনতর কিছুর জন্ম হয়। প্রাবন্ধিক এই তত্ত্বকেই বলেছেন—'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' বা 'ডায়েলেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম'। শুধু বিশ্ব প্রকৃতিতে নয় এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ মানুষের ইতিহাসের প্রবহমান ধারাতেও পাওয়া যায়। আর এ কারণেই একে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বা 'হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম' বলে।

প্রাবন্ধিক আরো বলেছেন যে, বস্তু থেকেই পৃথিবীতে প্রাণবীজ অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি হয়। প্রাণের আবির্ভাব এবং তার শিষ্যবর্গের গবেষণা এবং বিশ্লেষণের ফলে সাধারণ মানুষ জেনে গেছে। চেতনাহীন বস্তু থেকে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্তি—প্রাণী জগতে এটাও একটা সুবৃহৎ বিপ্লব। বস্তু বিকাশের শেষদান হিসেবে মানুষ পেয়েছে চৈতন্যকে। আর এই চৈতন্যের বিকাশের মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মানুষ প্রকৃতিকেই বন্দিনী করেছে। সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা-সংস্কৃতির আরো

নতুন হয়েছে, উচ্চতর স্তরে উঠে গিয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে এই উচ্চতর স্তরে উঠার পথই হল বিপ্লবের পথ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই যে বিবর্তন বা রূপান্তরের বিভিন্ন তত্ত্ব জানা গেল, তার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম, সংস্কৃতির রূপান্তরের অর্থাৎ উচ্চতর স্তরে উঠবার পথই হল সংকট এবং বিপ্লব—আর প্রবন্ধ লেখক বলেছেন যে, এই সংকট এবং বিপ্লবই হল ইতিহাসের সাক্ষ্য। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

"মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দশকে দশকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালে লয়ে।"

৩০৯.৪.১৩.৬ : ইতিহাসের সাক্ষ্য

প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির রূপান্তরের তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাক্ষ্য যেমন নিয়েছেন, তেমনি ইতিহাসের সাক্ষ্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, বিশ্ব নিয়মের পূর্বোক্ত মূল সূত্রটি অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাক্ষ্যকে যাঁরা মানতে চান না, ইতিহাসের পাতায় এই উৎক্রান্তির সাক্ষ্যকে তাঁরাও স্বীকার করেন। প্রাবন্ধিকের মতে মানুষের ইতিহাস মূলত শুরু হয় তার জীবিকা প্রয়াস হতেই। আর তার পরেই মানুষের ইতিহাস তার আত্মবিরোধের ইতিহাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তখন শুরু হয় তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য বিরোধ। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ এইভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হয়।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, সাধারণ জীবেরা প্রাণধারণের জন্য নির্ভর করে নিজনিজ পরিবেশের উপর, তাই জীবজগতের বড় শাস্ত্র 'পরিবেশ-বিজ্ঞান' (Ecology), কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ বিজ্ঞান মানুষের নিজের গুণে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ বিজ্ঞানে; অর্থাৎ (Ecology)-র স্থান নিয়েছে (Economics)। এর সূচনা হয়েছে আদিম মানুষের উন্নত দেহ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে। মানুষ যেদিন থেকে তার দৈহিক শক্তি এবং বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতে শিখেছে, সেদিন থেকেই জীবিকা-প্রচেষ্টার ও উন্নয়ন বা সংস্কার শুরু হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে জীবিকা উন্নততর করার মধ্যে দিয়েও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। তাই সংস্কৃতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে জীবিকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তার সাক্ষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিকের কথায় —

"সংস্কৃতির গোড়াকার কথা তাই জীবিকা, অর্থাৎ আর্থিক উদ্যোগ। সেই জীবিকার তাড়নায় মানুষ তাহা আয়ত্ত করিবার উন্নততর উপায় সর্বদাই খোঁজে, সমাজ তাহার আর্থিক বুনিয়াদ বারে বারে বদলায়।"

শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে যে শ্রেণী জয়ী হয়, সেই শ্রেণী পুরনো শ্রেণীর সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করে নিজেদের উৎপাদন প্রথা চালু করে। এভাবে বার বার নতুন শ্রেণীর জয়ী হবার ফলে পুরনো শ্রেণীর অনেক সৃষ্টি চুরমার হয়ে যায়, তার ধ্যানধারণা, ভাবনাচিন্তা, সাহিত্য সুকুমার কলা, রস নিদর্শন, যা কিছু সমাজ সভ্যতার

পরম গরিমা — তা সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায়। আর নতুন ভিত্তি গড়ে ওঠে উন্নততর ভূমির ওপর। তবে পুরানো সংস্কৃতি, তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টির সারবস্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না, প্রয়োজন মতো নতুনের সঙ্গে মিশে নবায়িত হয়ে ওঠে, নতুন সৃষ্টিতে, নতুন রূপে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই ভাবেই নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে নতুন মানসসম্পদ এবং এই ভাবেই ঘটে পুরনো সংস্কৃতির রূপান্তর।

৩০৯.৪.১৩.৭ : প্রস্তর যুগের বিবরণ

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস মানুষের জীবন-জীবিকার হিসেব মত যুগে যুগে বিভক্ত হয়। সেই যুগের বিশেষ বিশষ জীবিকা অবলম্বন ও উৎপাদন প্রথানুসারে, যেমন—প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি। মূলত বাস্তব উপকরণের উপাদান থেকে এই সমস্ত নামকরণ। মানব সভ্যতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। বহু বছর পর্যন্ত প্রায় প্রাজ্ঞনরের (Hominids) ইতিহাস, চীন, জার্মান, আফ্রিকায় এদের করোটি এবং নানা চিহ্ন পাওয়া গেছে। তারপরে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে 'হোমো সেপিয়েন্স' বা সজ্ঞান-নৃজাতি। প্রস্তর যুগই মানব সভ্যতার প্রথম যুগ। এই যুগই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগের কাল প্রায় ২ লক্ষ বছর। ২ লক্ষ বা আড়াই লক্ষ বছর পূর্বে এই যুগ আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে আদি যুগ, মধ্যযুগ ইত্যাদি ভাগ রয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে তা আমাদের মনে রাখতে হবে। মানুষ প্রথমে কুঠার, ছুরি, বর্শা প্রভৃতির সাহায্যে ছোটো ছোটো দলবদ্ধ হয়ে শিকার করত। শিকারের পশু আগুনে ঝলসিয়ে আহার করতো। কখনো বা ফলমূল খেত। মানুষ নদী ও সমুদ্র থেকে মাছ ধরতেও শিখেছিল। মোটের উপর খাদ্য সংগ্রহ ছিল অনিশ্চিত। মর্গ্যান এই যুগটাকে বলেছেন 'স্যাভেজারির' যুগ। বাংলায় 'অসভ্য' না বলে 'নিষাদ' সমাজের যুগ বলা হয়। মানুষের পরিবার বা সম্পত্তি কিছুই ছিল না। কাজে কাজেই সমাজ-সম্পর্ক ছিল জীবিকাগত ও মানুষবোধগত। তখন পর্যন্ত সমাজের শ্রেণী বিভাজন এবং শ্রেণী শোষণ দেখা যায়নি। সেই সময়টাকে বলা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে জীবন বিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চা নয়, জীবনের দায়ে এক প্রকার জীবিকা চর্চা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের 'ধর্মবোধ' বা 'মতাদর্শ'-এর এক বিশেষ পরিচয় এই 'যাদুতে'। অজ্ঞতা, ভয় আর বিস্ময় থেকে আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে স্বভাবতই নিজেদের ভাগ্য বিধাতা, ভূত বা দেবতা বলেই নিজেই সন্তুষ্ট করতো। এখনো অসভ্য জাতির মধ্যে তাই-ই ধর্ম। সেই সন্তুষ্ট করবার একটা প্রাচীন কৌশল যাদু বা মন্ত্রতন্ত্র, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নিজ কামনার অনুরূপে মানুষ শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে নাচে-গানে, নানা অনুকৃতিমূলক কাজে জীবজন্তু, বৃক্ষ-লতা-পাতা থেকে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য করত। যে ফল লাভ তাদের অভিষ্ট সেই ফল লাভ যেন ঐ অনুকৃতিমূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত্ব হয়, লক্ষ ও পদ্ধতি যেন অভিন্ন। এই রূপই ছিল তৎকালীন সময়ে মানুষের ধারণা।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের তুলনায় নব্য প্রস্তর যুগের সময়কাল কম। প্রায় দশ-বার হাজার বছর পূর্বে এই যুগের সূচনা হয়েছিল। মর্গ্যানের ভাষায় 'বর্বর' জীবনকাল। এই যুগে মানুষ কৃষি বিদ্যাকে আয়ত্ব করে।

ঘট ও পাত্র নির্মাণ করে, তার সঙ্গে পশুপালনও শুরু করে। আবার এই যুগের শেষে সূতো কাটা ও কাপড় বোনা শুরু হয়। এই সব কাজে মেয়েরাই ছিল মুখ্য। এই সময়কার সমাজে দুটি নতুন রূপ পেল। একটির বনিয়াদ কৃষিকাজ অন্যটি পশুপালন। কোনোটিরই বর্তমান সভ্যতায় গুরুত্ব হারায়নি।

৩০৯.৪.১৩.৮ : কৃষির দান এবং ধাতুর আবিষ্কার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী পরিবর্তন হল কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন। তাই পুরাতত্ত্ববিদেরা একে বলেন মানব সভ্যতার প্রথম বিপ্লব। কৃষির যখন আবিষ্কার হয়েছিল তখন মানুষ ছিল বর্বর জীবনের যুগে। ধাতু বা কাঠের খুন্তি বা পাথরের কোদালি দিয়ে বীজ বপন করত। এই ভাবেই চাষাবাদ চলতো। এই বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে। উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ইউরোপ, পূর্ব এশিয়ার বিশাল নদ-নদীর তীরে এই কৃষিকাজ চলতো। পরবর্তীকালে মিশরের নীল নদ, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস নদী, চীন দেশের হোয়াংহো, ইয়াংসি কিয়াং আর ভারতবর্ষের সিন্ধু নদের তীরে সভ্য জীবনের প্রথম জনপদগুলি গড়ে ওঠে। সেইসব সভ্য সমাজের সাধারণ নাম 'এশিয়াটিক সমাজ'। দীর্ঘকালব্যাপী নব্য প্রস্তর যুগের নানা কেন্দ্রে মানব জীবনযাত্রা বিভিন্ন হাতিয়ার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। এই সময়কালে মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ হল। সে যুগের চিন্তা ভাবনার কিছু কিছু সন্ধান আমরা পাই। তাদের সব সমাধিতে তার আড়ম্বরের আয়োজন দেখে।

জীবিকা অর্জনের সাফল্যের মধ্য দিয়ে ছোটো ছোটো গ্রাম পত্তন করে। প্রথম দিকে এই গ্রাম ছিল আত্মনির্ভর, শৃঙ্খলিত। কিন্তু এই নব্য প্রস্তর যুগের শেষে মানুষ পশুপালন ও কৃষিকাজ আয়ত্ত করে ঈষদুষ্ণ অঞ্চলেও এক একটি জায়গা স্থির করে ফেলল, অর্থাৎ গৃহস্থে পরিণত হল। জমি এবং পশু হল তার সম্পত্তি। এই অবস্থায় কৃষির প্রধান প্রয়োজন হল সেচ ব্যবস্থার, অর্থাৎ বৃষ্টি কিম্বা নদীর। তাই মেঘ বা ইন্দ্র-দেবশ্রেষ্ঠ, নীলনদ-দেবতা, গঙ্গা-দেবী, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি 'ভুত', ক্রমে দেবতা রূপে স্থান নিল। আবার এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ত বিদ্যার প্রচলন হল। আর কৃষির 'খণ্ড' বুঝবার জন্য গ্রহ-নক্ষত্রর বিচার বা জ্যোতির বিদ্যার প্রচলন ঘটল। কৃষির প্রথম দিকে অবশ্য জমি-জমা সবই ছিল 'জিন' বা জনের সম্পত্তি। 'জন' বলিতে এক একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে বোঝানো হত, আর জনপদ বলিতে এক-একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাসভূমিকে বোঝাতো।

ধাতুর আবিষ্কার ঃ

নব্য প্রস্তর যুগের অবসান ঘটল ধাতুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ধাতুর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দ্রব্যাদি একেবারে লোপ পেল না। প্রস্তর যুগের অনেক জিনিষ থেকে গেল। বর্বর জীবনের প্রথমার্ধের অবসান হলেও শুরু হলো দ্বিতীয় পর্বের 'উচ্চতর বর্বর জীবনের' পালা। ধাতুর ব্যবহারের মধ্যে মানুষ প্রথম যে ধাতু ব্যবহার ও আবিষ্কার করল তা হলো তাম্রধাতু। পরবর্তীতে ব্রোঞ্চ এবং তার পরবর্তীতে লৌহ ধাতুর আবিষ্কার হল।

আনুমানিক ছয় হাজার বছর পূর্বে প্রাচ্যে প্রথম আবিষ্কার হল তামার। তামার আবিষ্কারের দেড় হাজার বছর পরে আসে ব্রোঞ্জ ধাতু। এই দুইয়ের ফলে সমাজ গঠনেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষজ্ঞ কারিগরেই তামা ও ব্রোঞ্জের বস্তু নির্মাণ করতে পারে।

সমাজের বেশিরভাগ অংশ অবশ্যই চাষ, পশু শিকার এবং পশু পালনের মধ্য দিয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। মানব সমাজের সামান্য অংশই দক্ষ কারিগর বা যাদুকর বলে খ্যাতি অর্জন করত। খনি থেকে ধাতু তুলে চুল্লীতে তা গলিয়ে, হাতিয়ার তৈরী করা শুরু করল। ধাতুর আবিষ্কারের ফলে মানুষের মধ্যে ধাতব যন্ত্রপাতির প্রতি প্রত্যাশা বেড়ে গেল। ফলে একদিকে ধাতুর বস্তু কৃষিতে এবং বস্ত্রবয়নে প্রয়োজন হতে লাগল। ফলে সমাজে বহু যন্ত্রপাতির কারিগর রূপে দেখা দিল সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর, খোদাইকার, চর্মকার, স্বর্ণকার, মনিকার প্রভৃতি শ্রেণীর। সুতরাং সমাজে শ্রমবিভাজন দেখা গেল। সমাজেও পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ঘটল। ধাতব যন্ত্র ব্যবহারের এই প্রথম দিককার হাজার বছরকে তাই পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন বর্বর জীবনের "দ্বিতীয় বিপ্লবের" যুগ।

৩০৯.৪.১৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সংস্কৃতির অঙ্গ বলতে কী বোঝায়? এই অঙ্গ কয় প্রকার? –অলোচনা করো।

২। সংস্কৃতির বিকাশে ইতিহাসের ভূমিকা নিরূপণ করো।

৩। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করে তার তিন অঙ্গের পরিচয় দাও।

৪। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমম্পর্কে প্রাবন্ধিক গোপাল হালদারের ভাবনার বিস্তৃত পরিচয় দাও।

একক - ১৪

বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বশান্তি

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.৪.১৪.১ : বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বশান্তি

৩০৯.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.৪.১৪.১ : বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বশান্তি

বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায় হল—আণবিক শক্তির আবিষ্কার। এই আণবিক শক্তি আবিষ্কারের ইতিহাস না জানলে, না বুঝলে মানুষের ইতিহাসেরও জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসও মানবোতিহাসের একটা অঙ্গ, মানুষের জ্ঞানযোগের ও কর্মযোগের একটা ক্রমাধিকৃত প্রকাশ। নিশ্চয়ই এই পথ একটানা অগ্রগতির পথ নয়, মানুষের সুবুদ্ধির অবাধ বিজয়ের কাহিনী নয়। আনবিক যুগের দুর্বুদ্ধিও সেইরূপ একেবারে নতুন জিনিস নয়। আগুনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু আগুনের যদি অপপ্রয়োগ করা হয় তবে ধ্বংস নিশ্চিত। তাই বলে কি কেউ বলবে যে আগুনের কোনো কাজ নেই? তবে আনবিক শক্তির আবিষ্কারের বেলায়ই বা সে কথা খাটবে কেন? আসল কথা হল—দুর্বুদ্ধির হাতে তার প্রয়োগ অনেক মারাত্মক হয়ে ওঠে। এমনও নয় যে এই দুর্বুদ্ধি বা বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদ পৃথিবীতে থাকবে না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিকৃতির বিশেষ অবস্থায় সেই রকম হিটলারী-বুদ্ধির মানুষ জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসতে পারে, তাতো প্রমাণিত। আনবিক শক্তির আবিষ্কারের পরেও যদি সমাজ-বিকৃতি দূর না হয়, তার ফলও খুব সাংঘাতিক হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের পক্ষে। অতএব শুধু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রবর্তনে নয়, সামাজিক বিকৃতির মূলোৎপাটনেই বিজ্ঞানের বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক বিকৃতির শোধন—আর বিকৃত রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তির হাত থেকে এই প্রলয়াগ্নি দূরে সরিয়ে রাখা। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এজন্যই আপেক্ষিক সত্য কথা, সামাজিক বিপ্লবের, অন্তত বহু পরিমাণে বিকৃত সামরিক বুদ্ধির দমনের, এবং সেই সঙ্গে নতুন মানবিক মঙ্গলবোধের তা মুখাপেক্ষী। যে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে আনবিক বিজ্ঞানের জন্ম, সেই সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর মত সার্থক আয়োজনে, তখনি অগ্রসর হতে পারবে যখন আনবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ হবে,

যখন সাধারণভাবে মারণাস্ত্র ত্যাগ করে পৃথিবী দুর্বুদ্ধির ও নির্বুদ্ধিতার পথ বন্ধ করবে, এবং রাষ্ট্রনেতা ও যুদ্ধনেতাদের হাত থেকে সকল জাতি এই প্রহরণ কেড়ে নিতে পারবে—এক জাতির দ্বারা অপর জাতির শোষণ আর অস্ত্রবলে বজায় রাখা চলবে না।

আনবিক বিদ্যার সার্থকতার জন্যও এই বিশ্বশান্তি প্রয়োজন। বিশ্ববিপ্লবের ফলে বিশ্বশান্তি আসবে না, বিশ্ববিপ্লব আসবে বিশ্বশান্তির ফলে এই প্রশ্ন আণবিক শক্তি আবিষ্কারের পরে আজ এক বিপ্লবী জগতের বড়ো বিতর্ক, মতভেদেরও কারণ। এটা অনেকটা কুতর্ক। এই সব তর্কে না গিয়ে বরং বলা ভালো—বিশ্বশান্তির পথে যদি এক পা বাড়াই বিশ্ববিপ্লবের দিকেও আর এক পা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ও ঔপনিবেশিক শোষণের কবলমুক্ত সকল জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাতে বিশ্ববিপ্লবের সেইরূপ প্রথম পদবিন্যাস সুনিশ্চিত হচ্ছে। আবার বিশ্ববিপ্লবের এই পদস্থাপনা যদি সুদৃঢ় করতে হয়, তা হলে বিশ্বশান্তির দ্বিতীয় পদক্ষেপও তখনি প্রয়োজন—অর্থাৎ, চাই অবিলম্বে আণবিক অস্ত্র নিষেধ। তখনি আবার আসবে বিপ্লবের আরেক পদক্ষেপের সময়—প্রত্যেক জাতির আভ্যন্তরীণ আর্থিক বিকাশে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক সেবা ও সহযোগিতার নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা। এই সব ব্যবস্থার কোনো একটিকে একান্ত বা নির্বিশেষ বলে গণ্য না করে পরস্পরের সহায়ক রূপেই দেখা সম্ভব, এবং তাই-ই খাঁটি দেখা। কারণ আণবিক যুগে অন্তত বিশ্ববিপ্লবের নামে 'আগে বিপ্লব পরে শান্তি' এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে থাকা চলে না—লেনিনের নামেও নয়। অবশ্য পরাধীন কোনো জাতির স্বাধীনতার চেষ্টাকেও শান্তির নামে গৌণ করা উচিত নয়—সে প্রশ্নও ওঠে না। মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রতিক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝেই কৌশল স্থির করতে হবে। তাতে মতভেদও ঘটা সম্ভব। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, শান্তির সাধনাকেই বিশ্ববিপ্লবের অঙ্গ করে তুলতে হবে। বিশ্বশান্তিই কি কম বড় বিশ্ববিপ্লব?

বিশ্বশান্তি বিশ্ববিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করে দেয়, একথা মুনাফাবাদী ও শোষণধর্মী শক্তির খুব ভালো করে জানা। এজন্য মুনাফাবাদীরা শুধু সমাজতন্ত্র-বিরোধী নয়, তারা শান্তিবিরোধী ও যুদ্ধবাদী। পৃথিবীতে যুদ্ধ বা যুদ্ধের আতঙ্ক না থাকলে মারণাস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই দেউলিয়া হবে। মারণাস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে মুনাফার জালে ফ্রি ওয়ার্লড-এর (মুক্ত পৃথিবীর), 'ফ্রি এনটার প্রাইজ' (অবাধ ব্যবসায়) অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। তথাকথিত 'ফ্রিডম অব্ কালচার' ও সেই 'শোষণের ফ্রিডমেরই' পক্ষপাতী। যুদ্ধ না থাকলে এ সবের দুর্দশা। মুনাফাতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার পথে যুদ্ধ ও যুদ্ধাতঙ্ক তাই জীবন-মরণের প্রশ্ন। মারণাস্ত্রব্যবসায়ীরা অস্ত্রব্যবসাকে অন্যবিধ যন্ত্র-উৎপাদন শিল্পে ও ভোগ্য-উৎপাদন শিল্পে লাগালে পৃথিবী অবশ্য ভোগ্য ও কল্যাণপদ সমৃদ্ধিতে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু সে পণ্য কেনার মত মানুষ থাকা চাই—যে দামে মানুষ তা কিনতে পারে, সেই দামে মুনাফাতন্ত্র কতটুকু বজায় থাকবে?

মুনাফা থাকলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা খর্বিত থাকবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়শক্তি বাড়াতে হলে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি প্রয়োজন; মুনাফা বজায় থাকলে মজুরী বৃদ্ধিতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। এবার প্রশ্ন হল—সে পণ্য কেনার সামর্থ থাকবে কজনের? মুনাফার পাপচক্রে অস্ত্র ব্যবসা ও প্রায় অন্য সমস্ত

ব্যবসা এরকম মরণায়োজন রূপে বেড়ে চলেছে। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে এরকম মুনাফাতন্ত্রী ব্যবস্থার বিলোপ সুনিশ্চিত। শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হলেও মুনাফাতন্ত্রী দেশেও তখন অন্তর্বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এই সত্যটা স্পষ্টকণ্ঠে স্বীকার করতেও মুনাফাবাদীদের কারো কারো এখন বাধে না—শান্তিতে সমাজতন্ত্রীদের লাভ। কারণ তাদের উৎপাদন, বণ্টন, সেবা ও পালন সবই সামাজিক স্বার্থে চলে, মুনাফার উপর নির্ভর করে না। তাই শান্তি থাকলে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রয়োগে তাঁহাদের আর্থিক উদ্যোগের বিকাশমাত্রা দ্বিগুণ, চারগুণ হারে বেড়ে উঠবে। শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে ধনিকতন্ত্রকে পরাভূত করে দেবে। অন্যদিকে শান্তি থাকলে 'ফ্রি ওয়ার্লডে'র 'ফ্রি এনটারপ্রাইজ' অবশ্যম্ভাবী সংকটে জড়িয়ে বিপ্লবের মুখে গিয়ে পড়বে। একটি গুলিও সমাজতন্ত্রীদের নষ্ট করতে হবে না, মুনাফাতন্ত্রী সমাজ নিজের অভ্যন্তরীণ অন্তর্বিরোধে সমাজ বিপ্লবকে সুনিশ্চিত করে তুলবে। বিশ্বশান্তি তাই মুনাফাবাদী জগতের বিভীষিকা, জঙ্গীবাদী বিজ্ঞান, জঙ্গীবাদী সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প মুনাফাবাদীদের রক্ষাকবচ।

মার্কিন পুঁজিবাদ চতুর্দিকের অজস্র যুদ্ধঘাটি থেকে সমাজতন্ত্রী পৃথিবীর বুকের উপর সর্বদা বন্দুক ধরে বসে আছে, কিন্তু তাতেও মুনাফাতন্ত্রের দুশ্চিন্তা থেকে যাচ্ছে। এই সত্যি জেনে বুঝে ইউটু'র পরেও মুনাফাবাদী শক্তিসমূহের যুদ্ধায়োজনে সমাজতন্ত্রী শক্তিরাও আত্মরক্ষায় উদাসীন থাকতে পারে না। তবে কেন তারা যুদ্ধবাদী প্রচার নিষিদ্ধ করল? কেন শান্তির প্রচেষ্টাতেই সর্বস্ব পণ করল? প্রথমত, এটাই সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ সম্মত; সমাজতন্ত্রী বিকাশেরও পরিপোষক। আর শেষ এবং প্রধান কারণ হল—আণবিক বোমা আবিষ্কারের পর যা অনস্বীকার্য—তা মানবতার নীতি। মানুষকে নিয়েই তো সাম্যবাদ—কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়ে সাম্যবাদ রচনা করতে হবে—এমন অমানুষিকতা সাম্যবাদে গ্রাহ্য নয়। সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা, শ্রমিকশ্রেণীই সেই উচ্চতর মানবতার বাহক, পরিপোষক। কিন্তু সংস্কৃতির মহত্তর রূপান্তরেই সাম্যবাদের সার্থকতা।

কিন্তু প্রশ্ন হল সংস্কৃতির 'মহত্তর রূপের' অর্থ কি? কি সংস্কৃতির লক্ষ্য? উত্তর হল—'মানুষ'। এই উত্তরই এখন সোভিয়েত সংস্কৃতির মূলমন্ত্র 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

৩০৯.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গোপাল হালদারের অনুসরণে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করে তার তিন অঙ্গের পরিচয় দাও।

২। সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের সংযোগ 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রবন্ধে কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে–আলোচনা করো।

একক - ১৫
মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.৪.১৫.১ : মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

৩০৯.৪.১৫.২ : মানবতার পলিটিক্স ও মুনাফার পলিটিক্স

৩০৯.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.৪.১৫.১ : মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃতির বিচার করলে দেখা যাবে, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, ইত্যাদির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সংস্কৃতি। কিন্তু শুধুমাত্র 'কলাকৃতিত্ব' ও 'বিশুদ্ধ শিল্প নৈপুণ্য'—শব্দদুটি শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে চরমতম পর্যায় নয়। এর মধ্যে রয়েছে এক অর্ধসত্য মায়াজাল। অনেক সময়ই দেখা যায় ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ও ক্ষয়িষ্ণু জীবনবোধের খারাপ ফল হল এইরূপ 'কলাকৃতিত্ব'। শিল্পের অবশ্য একটি নিজস্ব মূল্য আছে। কেবলমাত্র বাইরের দৃষ্টিতে তা বিচার্য নয়—এই পুরাতন সত্য চিরদিনই সত্য। বিকৃত জীবনবোধের আবর্তে বণিকতন্ত্রের কলাকৃতিত্ব শুধু বিকৃতই নয় তার সঙ্গে বিষাক্তও। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সোভিয়েত ইউনিয়ানের শিল্পকলার উৎকর্ষতার আদর্শ বিকৃত নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সমস্ত মানবজাতির কাছে একটিই মাত্র জিজ্ঞাসা ছিল তা হ'ল মানব সভ্যতা কতদিন টিকবে? কিভাবে টিকবে। কিন্তু মাত্র অল্প কিছুকাল হল যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, সেই সোভিয়েত ইউনিয়ানের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল স্পষ্ট। তারা দেখিয়ে দিল একমাত্র সমাজতন্ত্রই এই সমূহ সমস্যার সমাধান করতে পারে। কারণ ফ্যাসীবাদ যে ভাবে সমগ্র বিশ্বকে করায়ত্ব করতে চলেছে তাতে সমগ্র মানব সমাজ-সভ্যতা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল তাদের অস্তিত্ব নিয়ে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ পরিচালনা করে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রশক্তি গঠন করে, তার অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর পৃথিবীর শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষের পয়লা নম্বরের দুশমনে পরিণত হয়। যাই হোক সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু কথা হল — সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম মানবতাকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিল। আর এই মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততার এটাই সোভিয়েত বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতির পরম মন্ত্র। বিশ্ব সংস্কৃতিতে এই চিরন্তন সত্যকেই এই যুগে সোভিয়েত যেন নতুন করে মূর্ত করেছে। কুবার সংকটের আত্মসংযমেও তারই প্রমাণ মিলল। ফলে সোভিয়েত জগতে যুদ্ধ প্রচার নিষিদ্ধ।

৩০৯.৪.১৫.২ : মানবতার পলিটিক্স ও মুনাফার পলিটিক্স

জাতির মানবতার প্রেরণা ও মুনাফার প্রেরণা এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব প্রথমাবধি। প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন সোভিয়েত মানবভ্রাতৃত্ব ও মার্কিন ভ্রাতৃত্ব এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় গঠিত দেশ। সেখানে ভূমি-প্রাচুর্যের অপ্রতুলতা রয়েছে, তার ভোগ্যবস্তুর আয়োজন এখনও বিভিন্ন দিকে সীমাবদ্ধ। জীবন মানে তারা শুধু যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় নিম্নস্ত তা নয়, সুইডেন, নরওয়ের তুলনায় ও ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় দরিদ্র ও নিম্নস্ত। শীতপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পশমের জামা ও চামড়ার জুতোও এখনো প্রত্যেকের সহজপ্রাপ্য নয়। তবে এমনটি মনে করার নয় যে তাদের ক্রয় করবার অর্থ নেই। আসলে তারা বিশ্বমানুষের শিক্ষার জন্য মহানব্রত গ্রহণ করেছে। মানব সৌভ্রাতৃত্বের বশবর্তী হয়ে অনুন্নত জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আগ্রহী হয়েছে।

মার্কিন ঐশ্বর্যের তুলনায় সোভিয়েত রিক্ত, তা সত্ত্বে পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য আর্থিক সাহায্যেই বা কেন তারা সাগ্রহে অগ্রসর হল—বিনা শর্তে, সামরিক উদ্দেশ্যেসিদ্ধিও দাবি করে না? আর এই উৎসাহ কতখানি আন্তরিক, কতখানি অকৃত্রিম তা বলা জন্য তিনি ভারতের ভিলাই, দুর্গাপুর, সুব্রত গড়, রাউড়কেল্লার বৈদেশিক বিনিয়োগের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য—"মানবতার প্রেরণা ও মুনাফার প্রেরণাতে এইরূপই তফাৎ—না হইলে মার্কিন রাজ্যের তো পুঁজির পরিসীমা নাই; জার্মান বা ব্রিটিশ কারিগররাও বিদ্যায়; অভিজ্ঞতায়, শিক্ষাসংগঠনে, ঐতিহ্যে তো কাহারও অপেক্ষা ছোটো নন।"

তর্ক ওঠাই স্বাভাবিক যে, এসব মানবতার জন্য নয়, পলিটিক্সই এর অন্যতম। পলিটিক্সেপলিটিক্সের এই কাঠামোর জন্যই সোভিয়েতের এই আর্থিক সহায়তা নবজাত জাতিগুলির প্রতি, আর তাদের এই দরদ ভাষার জন্য ও সাহিত্যের জন্য। কমিউনিজম তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্য তাদের ছাত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্য। ব্রিটেনও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির জন্য একটি বিশিষ্ট গবেষক পরিষদ গঠন করেছিল (British Society of Oriental and African Studies)। পরিষদটির বহুদিনের যত্নে শিক্ষার মান ও গবেষণার মান উন্নত হয়েছিল। এদের এই প্রয়াসকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, কোনো পলিটিক্স বা Policy-র জন্য তারা ব্রিটেনকে একটা 'লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়' গঠনের কথা বলল না বা সেই সম্পর্কে উৎসাহিত

করল না। শিল্পায়নের কারুবিদ 'কৃষ্ণ বা শ্যামল' গোষ্ঠী গঠনের প্রেরণায়ও তারা নিশ্চুপ থেকে গেল। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক গোপাল হালদারের সপ্রতিভ বক্তব্য—"কারণ, তাহা ইমনীরিয়ালিস্ট পলিটিক্স শোষণের পলিটিক্স মানবস্বীকৃতির পলিটিক্স নয়।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা গণতান্ত্রিক দেশ, মুক্ত পৃথিবীর নায়ক, মানবাধিকারের প্রবর্তক হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কালো চামড়ার কৃষ্ণবর্ণের দুর্ভাগা জাতির জন্য কোনো শিক্ষার আয়োজন নেই। যে শিক্ষা আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে, আত্মস্বাধীনতা অর্জনের শিক্ষা দেয় — তা থেকে তারা একশ শতাংশ বঞ্চিত। এমনকি প্রাবন্ধিকের আরো ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, যে তারা এখনো সেই প্রয়াসে অগ্রসর না হয়ে শুধুমাত্র অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও অসামান্য কারুবিদ্যার দিকেই লক্ষ রেখে চলেছে। তারা কোনো শর্ত ছাড়া কোনো পিছিয়ে পড়া তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন— "ইহারও কারণ পলিটিক্স—মার্কিনের মুনাফাবাদ ও জঙ্গীবাদের পলিটিক্স"।

একথা একান্তভাবে স্বীকার্য যে সবকিছুর পিছনে পলিটিক্স যুক্ত। তবে সেই নীতিরও আবার একাধিক দিক আছে। এবং সমাজ জীবনে তার অবশ্যই কুফল ও সুফল আছে। পলিটিক্সের উর্ধ্বেও একটি জিনিস থেকে যায়—সেটি মানবতা তথা সৌভ্রাতৃত্ব ও শুভবোধ। যার থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে সুস্থ সংস্কৃতির। সকল রাষ্ট্রই পলিটিক্যাল ভাবে মূর্তশক্তি। অ্যারিস্টটলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়, 'মানুষ শুধু পলিটিক্যাল জীব নয়।' তাই তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলিকে ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে।

মুনাফার পলিটিক্স মানুষকে টাকার অঙ্কে বিশ্বাস করতে শেখায়। সেখানে মানুষের কাছে সবকিছুর মাপকাঠি হয়ে ওঠে টাকা। কারণ—"মুনাফা শিকারের পলিটিক্স মুনাফার সংস্কৃতিতে মানুষ শিকারের সংস্কৃতিতে পরিণত করিয়া তোলে।"

অন্যদিকে—শোষণ-মুক্তির পলিটিক্স সৃজনমুখী সংস্কৃতিকে দেয় মানবতার দীক্ষা — পরিণত করে মানবভাতৃত্বের সংস্কৃতিতে, মানব-বিশ্বাসের সংস্কৃতিতে। স্বভাবতই বোঝা যায় প্রাবন্ধিকের মানব ভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতি তথা মানব বিশ্বাসের সংস্কৃতির উপরই সম্পূর্ণই আস্থা। অর্থাৎ যে পলিটিক্স মানুষকে শিক্ষা দেয় তাই মানুষের কাম্য। তাই তিনি স্পষ্ট করে বলেন—"দুই-ই যদি পলিটিক্স হয়, তবে সেই পলিটিক্স মানবতার স্বপক্ষে তাহাই মানুষের জীবনদায়ী পলিটিক্স মুনাফা শিকারের পলিটিক্স তো মানুষ শিকারের পলিটিক্স—অমানুষিক পলিটিক্স।"

তুলনামূলক বিচারে একথা বলতে হয় ঐশ্বর্যের সংকল্প বিরাট হলেও সোভিয়েতের এখনও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের সবদিকে তারা এখনও সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তবে কারু বিজ্ঞানে তারা মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসীকে ইতিমধ্যেই পিছনে ফেলে দিয়েছে। তাই বলা যায় ভবিষ্যৎ তার বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিতভাবেই আসবে। ধনিকতন্ত্রের গণ্ডীটানা জায়গায় বদ্ধ থেকে তাদের বেশ কিছু ব্যাপারে ক্ষতি হচ্ছে, তারা বিবর্জিত হয়েও উঠেছে। ফলে স্বয়ংসন্তুষ্ট ও আহত আত্মমর্যাদাবোধ প্রশ্রয় পেয়েছে। সেই সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মেছে। তাই মার্কসবাদী প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার বলেছেন—"তাহার

অতি দ্রুতগঠিত সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যেও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইতেছে,—যতটা তাহার ব্যাপ্তি আছে, ততটা গভীরতা জন্মায় নাই। আর্থিক বিকাশে ও আধ্যাত্মিক বিকাশে তাহার এক একদিকে যতটা উন্নতি, কোনো কোনো দিকে তেমনি শ্লথতা থাকিয়া গিয়াছে।"

সোভিয়েত মানব জীবনের অন্তর্নিহিত চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়। বাইরে জাঁকজমক জমকালো ভাবকে তারা তোয়াক্কা করে না। মানব জীবনের Basic needs গুলি পেয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকে, এবং এরই মাধ্যমে উন্নতির চরম শিখরে তারা পৌঁছাতে চায়। তাই দেখা যায়—"আজন্ম-মৃত্যু জীবনযাত্রার সকল বিভাগ সমাজতন্ত্রী কাঠামোতে বিধৃত বলিয়া সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ শত্রু আমলাতান্ত্রিক মূঢ়তা ও উগ্রতা ও প্রশাসনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া বসিতে চাহে এবং বসেও।"

সমগ্র আলোচনা শেষে বলা যায়, মার্কিন সংস্কৃতির মতোই সোভিয়েত সংস্কৃতির একটি বড়ো সমস্যা—'কারুবিজ্ঞানের চাপে মানববিদ্যার অসমান বিকাশ'। এটা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে অবশ্যই আসবে। সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা, ভুলত্রুটি, দোষগুণ থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েতের সমাজ জীবন্ত, চলন্ত, বিবর্ধমান। একাধিক অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও সোভিয়েত সংস্কৃতির এই প্রধান সত্যের মূলে নিহিত আছে এই সত্য—"মানবতায় বিশ্বাস, বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন ও সার্বজনীন প্রয়োগ, বিশ্বমানবের মুক্তি, বিশ্বশান্তির দুশ্চর তপস্যা ...."

এটাই সোভিয়েতের মূল সাধনা। প্রাবন্ধিক মানব সভ্যতার এই অন্তর্নিহিত দিকটিকেই তুলে ধরেছেন। যেটি আজও আমাদের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি।

৩০৯.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং সংকট বলতে প্রাবন্ধিক কি বুঝিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করো।

২। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক 'মানবতার রাজনীতি' ও 'মুনাফার রাজনীতি' বলতে কি বুঝিয়েছেন?—আলোচনা করো।

একক - ১৬

সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

বিন্যাসক্রম :

৩০৯.৪.১৬.১ : শ্রেণীবিভক্ত সমাজ

৩০৯.৪.১৬.২ : পুঁজিবাদের উদ্ভব, সংকট এবং বৈশিষ্ট্য

৩০৯.৪.১৬.২.১ : জাতীয়তাবাদ

৩০৯.৪.১৬.২.২ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

৩০৯.৪.১৬.২.৩ : গণতন্ত্র

৩০৯.৪.১৬.৩ : সাম্রাজ্যবাদের সংকট

৩০৯.৪.১৬.৪ : সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

৩০৯.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৯.৪.১৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৯.৪.১৬.১ : শ্রেণীবিভক্ত সমাজ

সভ্যতার আদিযুগে আমরা দেখি পশুপালন ও কৃষিকর্মের ফলে যেমন পশু, শস্য, যন্ত্রপাতির জমির বৃদ্ধি হয়, তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়ল। চাষের সুবিধার জন্য এক এক খণ্ড জমি এক এক গোষ্ঠীর হাতে গেল, পরে সেই গোষ্ঠী ভেঙে তার অংশ স্বরূপ পরিবারের হাতে জমির সত্ত্ব থেকে গেল। এদিকে তখন তাঁতে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হয়েছে। ধাতু গলিয়ে নতুন নতুন অস্ত্র এবং অলংকার তৈরী হয়েছে অর্থাৎ গৃহশিল্পের সূচনা হয়েছে। তবে যারা দরিদ্র, নিঃস্ব তারা ঐসব বস্ত্র ও যন্ত্র পায়না। পশুপালন, কৃষিকর্ম, কুটির শিল্প— এই সবের জন্য ক্রমেই দাসেদের প্রয়োজন বাড়ে।

এরপর দরকার হল শ্রমবিভাগ—কারণ কৃষির ও পশুপালনে উন্নতিতে উৎপাদন বেড়েছে, সকলের সব কাজ করার দরকার নেই। কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৃত্তিধারী শ্রেণী যখন দেখা দিল, তখন উৎপাদন শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে শ্রমবিভাগের সঙ্গে শ্রেণীবিভাগও আরো পাকা হয়ে

ওঠে। এই ব্যবস্থায় বহুদিন পর্যন্ত জমিও উৎপন্ন দ্রব্য তবু পরিবারগতই ছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হয়নি।

এইভাবে পরিবারের আবির্ভব মানুষের মানসিক জীবনেও একটা বড়ো ঘটনা। আজ মানুষ পারিবারিক সম্পর্কের অপেক্ষা পবিত্র সম্পর্কের কথা কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু প্রধানত টাকার আবির্ভাব হয় সমাজের আর্থিক পরিবর্তন ও বিন্যাসের তাগিদে। প্রাচীন সমাজ প্রায়ই ছিল মাতৃ প্রধান সমাজ। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের যুগে নারী এঁটে উঠতে না পারায় শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়। এইভাবেই মানব শিশুর পিতৃপরিচয়-এর প্রথম সূচনা হয়। আরো পরে নারীরও কর্তৃত্বের ধীরে ধীরে অপসারণ ঘটে, যুদ্ধ বিগ্রহ, জমি চাষ, ধাতু শিল্প তখন পুরুষসাধ্য কঠিন কাজ। অন্যদিকে শ্রমবিভাগের প্রসারে বিশিষ্ট বৃত্তিধারীও দেখা যায়। ঐ সব কাজে নারীর স্থান হয় গৌণ। সংসারেও তাই তাদের স্থান গৌণ হয়ে পড়ে। প্রধান কাজ হয় রান্নাবান্না ও সন্তান ধারণ ও পালন করা।

তখন কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে শিল্প, তখন ধীরে ধীরে জিনিসপত্রের বিনিময় আরম্ভ হয়। আরম্ভ হয় বেচাকেনা, লেনদেন। বর্তমান যুগের উৎপাদনের যা সব বড় লক্ষণ সেই পণ্যজাত এভাবেই সমাজে আসে। এই বিনিময়ের কাজটা সরাসরি এখনো কোথাও কোথাও চলে। এর পরের স্তরগুলি শ্রমবিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মধ্যে থেকে ক্রমে ফুটে বার হতে থাকে। বহিঃশত্রু থেকে রক্ষার জন্য পরিবারগুলি ঐক্যবদ্ধ হত, এখানেই কূল একত্র হত tribal বা উপজাতি। যুদ্ধের প্রয়োজনে তারা চাইল নেতা, যাদু শক্তির প্রয়োজনে পুরোহিত। অনেক প্রাচীন দেশে এরূপ বিভাগ ছিল যা শ্রেণীবিভাগকে পাকা ও অনড় করে রেখেছিল।

তারপর ধীরে ধীরে দেখা দিল দুটি শক্তি। এক ক্ষত্রিয় শক্তি, যুদ্ধ যার কাজ ও পুরোহিত শক্তি। প্রাচীন মিশরের মতো অনেক দেশে এই পুরোহিত শক্তি হতেন শাসক। শেষে শাসক থেকে সৃষ্টি হল রাজার। এবার রাজ্যের জন্ম হয়। ব্যবসায়ীদের স্থান এদের নীচে। আসল প্রভুশক্তি ক্ষত্রিয় আর পুরোহিতরা। বণিকেরা তাদের নীচে—তাদেরই সহযোগী, কিন্তু স্বশ্রেণীর নয়। পরাজিত, বন্দী, শোষিত দাসদের কাজ হল এই তিন শক্তির সেবা অর্থাৎ সকলের জন্য পরিশ্রম ও খাদ্য উৎপাদন। ক্ষত্রিয় শক্তির কাজ পররাজ্য লুণ্ঠন প্রভৃতি। একদল পরিশ্রম করবে অন্যদল তার ফলভোগ করবে—সমাজের মধ্যে এই একটা বৈষম্য ও বিরোধীতার সম্পর্ক এইভাবে আদিম সাম্যবাদ ভেঙে 'সভ্য সমাজ'-এর যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে স্থায়ী হয়ে গেল।

৩০৯.৪.১৬.২ : পুঁজিবাদের উদ্ভব, সংকট এবং বৈশিষ্ট্য

রোমের পতনের পরে পাশ্চাত্য জগতে অন্ধকার যখন চেপে বসেছে, তখন একটু একটু করে ইউরোপে যে সমাজ গড়ে ওঠে তাকে 'ফিউডাল' বা সামন্ত সমাজ বলে। দুটি শ্রেণীতে ফিউডাল সমাজ বিভক্ত ছিল — উপরে জমিদার স্বরূপ সামন্তরা আর নিচে সাধারণ সার্ফ বা ভূমিদাস কৃষক। ফিউডাল সমাজ তাই প্রধানত

গ্রাম্য সমাজ, চাষী ও কারিগরের সমাজ। কিন্তু ক্রমশ এই সমাজব্যবস্থাতেও কারিগর কারবারীদের ব্যবসার প্রাধান্য লক্ষ করা গেল। বলাবাহুল্য, কালক্রমে ব্যবসায়ী বণিকেরাই কারিগর রেখে কারখানা গড়বে, পুঁজিপতি হিসেবে তারাই হবে শিল্পপতি, তৈরী করবে পুঁজিতন্ত্রের যুগ বা বুর্জোয়া যুগ। সামন্ততন্ত্রের অবসান হলে আসে বণিকতন্ত্রও বণিক-পুঁজিবাদের যুগ। তারই পরিণতি হল বুর্জোয়া ধনিকদের যুগ-শিল্পপতির পুঁজিতন্ত্র বা ইন্ডাসট্রিয়াল ক্যাপিটালিজমের প্রসার।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের মধ্যে দিয়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব-প্রসার ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে একদিকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার নতুন নতুন কলকারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। দীর্ঘকালের পচাগলা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন হয়ে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক ভালো ব্যবস্থা হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

ব্রিটিশ বুর্জোয়া বণিকদের লুটকরা পুঁজি, শিল্প বিপ্লবের পুঁজি রূপে স্বীকৃতি পায়। এই সময় পৃথিবীতে শিল্পযুগের গোড়া পত্তন হল, কারণ বিজ্ঞানের আবিষ্কার, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে পুঁজি নিয়োগের ক্ষেত্রভূমি দিন দিন প্রসারিত হল। ব্রিটেনের কারখানা বিস্তারের পুঁজিটা এসেছিল প্রধানত ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে। বিদেশী বণিকই রাজা; আমাদের দেশের পুরানো হাতের কাজ বিলেতের কলের কাছে দাঁড়াতে পারলো না। দেশীয় শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে হয় চাষী হল নয় কলের মজুরে পরিণত হল। যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাটতে গেলে মজুরদের নিজেদের উদরপূর্তির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাঁধা দিতে হয়। এটাই পুঁজিতন্ত্র বা বণিকতন্ত্র (Capitalism)। এই প্রথার যন্ত্র থাকে মালিকের হাতে, তা মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যন্ত্রজাত উৎপাদিত পণ্য তৈরী হয় কারখানার শ্রমিকদের সমষ্টিগত পরিশ্রমের ফলে (Socialized Labour)। উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য যা সর্বাংশে তা শ্রমিকের পরিশ্রমের সমতুল্য। কিন্তু মজুর পায় সেই মূল্য থেকে সামান্য অংশটুকু মজুরী রূপে। অবশিষ্টাংশ মালিক মুনাফারূপেই ভোগ করে। মুনাফাটা আসলে উদবৃত্ত শ্রমমূল্যের (Surplus Values)। অর্থাৎ মুনাফার অর্থ হল শ্রমিকের মেহনতির সেই শ্রমের ভাগ যা শ্রমিককে না দিয়ে মালিক নিজে আত্মসাৎ করে।

পুঁজিবাদের সংকট :

ঊনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতা মূলক বিকাশের পর, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদ প্রবেশ করে সাধারণ সংকটের মধ্যে দিয়ে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এই পর্বে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট হয়েছিল তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। এর প্রথম পর্যায়টি ছিল ১৯২৩-২৪ সাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল ১৯২৪-২৯ পর্যন্ত। তখন সংকট থেকে পুঁজিবাদের আংশিক পুনরুদ্ধার ঘটে। এই সময়টা ছিল পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীলতার সময়। তৃতীয় পর্যায়, অর্থাৎ ১৯২৯-৩৩; এই সময় চলে পুঁজিবাদী বিশ্বের মহামন্দার পর্যায়, গভীর সংকটের মধ্যে প্রবেশ করে পুঁজিবাদ, যার জের পড়ে প্রায় সর্বত্র।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ প্রচলিত উৎপাদন সংকটের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রশক্তির পরিমাণ ৬.৫ লক্ষ অশ্বশক্তি থেকে বেড়ে ৩৯ কোটি অশ্বশক্তিতে পৌঁছেছিল। কেবল ১৯১৩ থেকে ১৯২৭

সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৭ বিলিয়ন ইউনিট ২০০ বিলিয়ন ইউনিটে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সবরকম শক্তি মেলালে ১৯২৭ সালের বিশ্বের মোট শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি অশ্বশক্তির সমান। ১ অশ্বশক্তি মানে প্রায় ৬ জন মানুষের পেশীশক্তির সমান ধরে নিয়ে দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার আবার বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেকটি মানুষ পিছু ৫ জন কৃতদাসের শক্তি মজুত ছিল। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব কমেনি। ১৯১৩-২৮-এর মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা মাত্র ১১.৬ শতাংশ বাড়লেও খাদ্যের রপ্তানীর পরিমাণ বেড়েছে ১৪৭ শতাংশ। তবু অনাহার ও বেকারী এই সময়কালে বেড়েছে বৈ-কমেনি। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা আমেরিকায় ৯.০৩ লক্ষ থেকে ৮.৭৪ লক্ষে নেমে এসেছে। ব্রিটেনে ১৯২৩-এর মধ্যে এটা ৮.৩৬ লক্ষ থেকে ৭.৮৯ লক্ষ কমে গিয়েছে। লক্ষ করা দরকার, এসব হল ১৯২৯-৩৩-এর বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের শুরু হওয়ার আগের কথা। ১৯৩৩ সালে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বেকার সংখ্যা ৫ কোটিতে এসে ঠেকেছিল। ১৯১৩-১৯২৮-এর মধ্যে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার জাতীয় আয়ের যে অংশটা মজুরীর জন্য তার পরিমাণ কমতে লাগল। মুদ্রাস্ফীতি শ্রমজীবী মানুষের এই আয়টুকু শুষে নেয়। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত। প্রথম মহাযুদ্ধের বাজার ভাগাভাগি করে নেওয়ার পর বাইরের বাজারও সীমিত হয়ে যায়। নভেম্বর বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ অংশ পুঁজিবাদের হাতছাড়া। ফলে সংকট তীব্রতর হল ১৯২৯ সালে সংকট এবং যুদ্ধ ও পররাজ্য গ্রাসের সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী অভিযানের মধ্যে দিয়ে তার সমাধানের প্রচেষ্টা থেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল সেই বিবরণে যাওয়ার আগে ১৯২৪-২৯-এর সাময়িক পুনরুদ্ধার স্থিতিশীলতার আসল চরিত্রটা বোঝা দরকার।

এই সময়টা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার অবস্থার পুনরুদ্ধার করার জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদের শেষ ও মরিয়া প্রচেষ্টার সময়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর দ্বন্দ্বগুলির তীব্রতা বৃদ্ধি, ইউরোপের কয়েকটি দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। রুশ বিপ্লব সম্পন্ন হলেও জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইতালী ইত্যাদি দেশে বিপ্লব পরাস্ত হয়। বিপ্লবের আতঙ্কের খাঁড়া শাসকশ্রেণীর মাথার উপর ঝুলে থাকলো। এই উদ্ভুত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে পুঁজিবাদের সংকট আরো তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে।

শিল্পপতিরা পরশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্য সস্তায় কিনে মুনাফা করে। শ্রমিককে তার শ্রমমূল্য আসলে ফাঁকি দেয়। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা জিনিসটা শ্রমিকেরই উদ্বৃত শ্রম—শ্রমিকের যে পরিশ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরী পায়না, তারই নাম মুনাফা। এই মুনাফার উপরই বুর্জোয়ার ঐশ্বর্য গড়া, বাণিজ্যগড়া, তার পুঁজি গড়া—গড়া এই বুর্জোয়া সভ্যতা। এই মুনাফার লোভই হল তার সমস্ত প্রয়াসের মূল কথা। প্রাবন্ধিকের মতে —

"সেই মুনাফার লোভে সে বাণিজ্যের নামে সাম্রাজ্য আয়ত্ব করে, মুনাফার লোভে বিজিতদের শিল্প নষ্ট করিয়া নিজের মাল চালায়, একচ্ছত্র মুনাফা ভোগের আশায় সে সেখানে একচেটিয়া বাজার দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাসও ইহাই, এই মুনাফার শিকার।"

ভারতবর্ষে ইংরেজরা উপনিবেশ গড়ে তুলল—ব্যবসার স্বার্থে, সর্বোপরি নিজেদের স্বার্থে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া বণিকের লুঠ করা ঐশ্বর্যের দ্বারাই ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ হয়। তাতেই আবার পৃথিবীতে

শিল্পযুগের গোড়াপত্তন হল। কারণ, বিজ্ঞানের ক্রম প্রসারিত জ্ঞান তখন কতগুলি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। ফলে জিনিস তৈরী করা যায় অনেক বেশি এবং অনেক তাড়াতাড়ি। মানুষ অপেক্ষা কলে কম খরচে বেশি মাল উৎপাদন হয়, এই কথা দাসপ্রথায় গ্রীস-রোম বা সমাজতন্ত্রী ভারতবর্ষ-চীনও বোঝেনি, কিন্তু ইংরেজ বুর্জোয়া বণিকেরা এই কথা বুঝেনি, কিন্তু ইংরেজ বুর্জোয়া বণিকেরা এই কথা বুঝেছিল ভালোভাবেই। তাই নতুন কলকারখানা বসাতে থাকল। ব্রিটেনের এই কারখানা বিস্তারের পুঁজিটা এসেছিল প্রধানত ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য থেকেই। বিদেশী বণিকই তখন এদেশের রাজা। আমাদের দেশের পুরানো হাতের কাজ বিলেতের কলের সামনে তখন আরো টিকতে পারল না —

"দেশীয় শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া গিয়া হয় চাষী হইতে চাহিল, নয় কলের মজুর হইতে লাগিল। যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাটিতে গেলে মজুরদের নিজেদের উদরপূর্তির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাঁধা দিতে হয়। ইহাই পুঁজিতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (Capitalism)।"

এই প্রথায় যন্ত্র থাকে মালিকের হাতে, তা মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যন্ত্রজাত দ্রব্য তৈরী হয় কারখানার মজুরদের সমষ্টিগত পরিশ্রমে। অর্থাৎ এই তন্ত্রের সমীকরণটা দাঁড়ায় এই রকম —

উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য = মজুরদের সমষ্টিগত পরিশ্রম

মজুরের প্রাপ্য = বেঁচে থাকার মতো মজুরী

মুনাফা = উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য — মজুরদের মজুরী

মুনাফা = সমষ্টিগত পরিশ্রম — মজুরদের মজুরী

মুনাফা = উদ্বৃত শ্রমমূল্য

এদিকে যত কল বাড়ে, যত বেশি সংখ্যায় মজুর খাটে, যত বেশি মজুর কাজ দেয় — ততই এই মুনাফা ফেঁপে ওঠে। তাতে কল মালিকের পুঁজি আরো বাড়ে। আবার সেই পুঁজিতেই বসে নতুন কল-কারখানা। এই নিয়মে দেড়শত বছরে আজ ইতিহাসে যন্ত্রযুগের বিবর্তনে অতিকায় কারখানার পর্ব দেখা দিয়েছে—যন্ত্রই সেখানে প্রধান, মজুরও সংখ্যায় স্বল্প প্রয়োজন। প্রাবন্ধিক লিখেছেন —

"যুগ হিসাবে আজ সভ্যতার ইতিহাসে দেখা দিয়াছে কৃষিযুগের শেষে এই শিল্পযুগ। বুঝিতে হইবে—যন্ত্রবলের প্রসারে এখন আবার উৎপাদন শক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এই মুনাফাদারীর হাত হইতে মুক্তি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।"

অর্থাৎ সমাজ ও সভ্যতা রূপান্তরিত হতে চলেছে এটাই লক্ষণীয় বিষয়। প্রাবন্ধিক শুধুমাত্র পুঁজিবাদের উদ্ভবের ইতিহাসের অনুসন্ধানই করেননি, এই যুগের বিশেষ লক্ষণগুলি সম্বন্ধেও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। সভ্যতার ইতিহাসে পুঁজিবাদের স্বরূপ-লক্ষণকে স্পষ্ট করে সমাজে যে পরিবর্তন এসেছিল তা ব্যাখ্যা করেছেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

৩০৯.৪.১৬.২.১ জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ মানুষের সহজাত। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের আধিক্যেই মানুষ বাণিজ্য প্রসারের দায়ে পররাজ্যগ্রাসী হয়। এমনকি অধীন জাতির জাতীয়তাবোধেও বাধা দেয়। যেমন, ইংরেজ চেয়েছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে চাপা দিতে; ওলন্দাজরা চেয়েছে ইন্দোনেশীয়ার জাতীয়তাবোধের উপর হস্তক্ষেপ করতে। এই যুগেই জাতীয়তাবোধ প্রকটভাবে দেখা দেয়।

৩০৯.৪.১৬.২.২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য

পুঁজিবাদের প্রয়োজন ছিল মজুরদের। নবজাত বুর্জোয়া তখন বলেছিল, প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করার অধিকারী হোক—কেউ যেন অন্যের ক্রীতদাস বা ভূমিদাস বা গোলাম না থাকে। সামন্ত যুগে শিল্পী-কৃষকেরা দাসস্বরূপ ছিল। সামন্তযুগের ভূমিদাসদের এই রকম 'স্বাধীন' মজুরে পরিণত না করতে পারলে পুঁজিদার তখন কলের মজুরই পেত না। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হল পুঁজিদারেরা। পুঁজিদারের নিজের কাম্য ছিল ব্যক্তিগত মুনাফা, তাই নিজের শ্রম অর্জিত সম্পত্তিতেও প্রত্যেকেই অখণ্ড অধিকারী— এইরূপ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নীতিতে তারা বিশ্বাস করতেন।

৩০৯.৪.১৬.২.৩ গণতন্ত্র

মানুষের অধিকারের দাবী নিয়ে বণিক-ধনিকেরা মধ্যযুগের সামন্ত ও যাজকদের পুরুষানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করেন। এবং সেই বণিকেরা ক্রমে রাষ্ট্রচালনায় নিজেরাই প্রধান পদ গ্রহণ করেন। জনগণের সাহায্য ছাড়া এই রাষ্ট্র ক্ষমতা আয়ত্ব করা যায় না। তাই তাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল রাষ্ট্র স্থাপন করেন—এটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুর্জোয়াদের এই গণতন্ত্রের অর্থ—রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এতে আর্থিক বৈষম্য বিদূরিত হবে, বরং ব্যক্তিগত থাকল। তাতে মনিব আর মজুরের ধনের বৈষম্য আরো বেড়ে গেল। ধনিক শ্রেণীর হাতেই অর্থের প্রাচুর্য—ফলে সমস্ত রকমের সামাজিক সুযোগ সুবিধা তারাই ভোগ করতে থাকল। অন্যপক্ষে দরিদ্র্য শ্রেণী, বঞ্চিত শ্রেণী, তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্র সত্ত্বেও তারা খেতে পায় না, পরতে পায় না, লেখাপড়ার সুযোগ পায় না, পায় না রাজ্য পরিচালনায় নিজেদের অধিকার আদায় করতে। অর্থাৎ এই গণতন্ত্রে রাজনৈতিক গণতন্ত্র থাকলেও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নেই। ধনিকের চালিত গণতন্ত্রের ভিতরের অবস্থাটা এরকমই। বলা যেতে পারে যতদিন ধনিকতন্ত্র আছে ততদিন প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পুঁজিবাদের অন্তঃস্বরূপটিকে প্রাবন্ধিক স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তবুও বলা যায়, এই পুঁজিবাদের যুগ মধ্যযুগীয় দাসপ্রথা কিংবা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক উন্নত। কারণ এই পুঁজিবাদের ফলেই মানুষ গণতন্ত্রের অধিকার পেল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তার আস্থা ফিরে পেল। যদিও এই নীতি তারা নিজেদের স্বার্থেই গ্রহণ করেছে —

"তবু তাহাতে মানুষের অধিকার কিছুটা প্রসারিত হইয়াছে, সভ্যতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।"

লেখকের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও দেখা যায় শ্রেণীর স্বার্থে এই সব সৎনীতি আবার পুঁজিতন্ত্র খর্ব করতেও বাধ্য হচ্ছে, এমনই ক্ষীয়মান পুঁজিতন্ত্র।

৩০৯.৪.১৬.৩ : সাম্রাজ্যবাদের সংকট

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে—যা আমরা সবাই জানি। মুনাফার লোভে পরের দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্র প্রথম জয় করল। এরপর সেই দেশের শিল্প বণিকেরা অপরের শিল্প দ্রব্য বিনষ্ট করল এবং চালাতে লাগল নিজের দেশের দ্রব্য। বিজিত দেশের শিল্পীরা তখন বৃত্তি হারিয়ে হল চাষী, বাড়ল সেই দেশের হতভাগ্য চাষীর সংখ্যা। আবার সাম্রাজ্যের শোধনের সুবিধার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী, সেই অধীন দেশ থেকে বেছে বেছে তৈরী করল তাদের এক তল্পিদার শ্রেণী, রাজা, জমিদার,তালুকদার, মুৎসুদ্দি। আর শেষে কেরানী। কিন্তু বিজিত দেশে প্রথমদিকে বিজেতা ধনিকতন্ত্র কলকারখানা করতে বাধা দিল—পাছে নিজের দেশের পণ্যজাতের সঙ্গে ঐ সব অধীন দেশের কলের মাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ঐ ভয়ে। সেখানকার তেল, কয়লা, পাট, তুলো প্রভৃতি মাল নিজেরা একচেটিয়া করে নিল। তা দিয়ে এই বণিকেরা নিজেদের কলকারখানায় কাপড় বুনে ঐ পরাধীন দেশেই একচেটিয়া চালান করে। একেই বলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা।

এই অবস্থায় নিজের দেশে ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতিরা হয়ে পড়ল এইসব ব্যবসার মালিক। শোষণের নেশা বেড়ে গেল। অথচ শোষিতের রক্তাল্পতা দেখা যাচ্ছে। পরাধীন দেশের নিজের হাতে শিল্প নেই, আছে শুধু চাষী, সেই চাষের উপর সবাই নির্ভর করে—রাজা-জমিদার, মহাজন তো আছেই বড় মাইনের কর্মচারী আছে, বিলাতী পেনশন, ভাতা প্রভৃতিও আছে—এদের সব ধরনের এই লুটের বোঝা গিয়ে পড়ল দেশের উৎপাদকের ওপরে। কিন্তু কে সেই উৎপাদক। এরা মূলত চাষী, আর আছে কয়েকজন খনির ও কলকারখানার মজুর। এরা এই বোঝা বহন করতে করতে মুখ থুবড়ে পড়ে আর দেশের রাজস্ব জোগাতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদীর চালানো মালও কিনতে পারে না, আর পাওনাদারদের পাওনাও তারা মেটাতে পারে না।

সাম্রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে পুঁজিতন্ত্র নানাভাবেই অচল হয়ে পড়েছে। কারণ —

প্রথমত, আন্তর্জাতিক জগতে পুঁজিবাদীদের জাতের মধ্যে রেষারেষি বাড়ছে তার ফলে যুদ্ধ বাঁধছে। শিল্পপ্রধান প্রতি জাতিই নিজের শিল্পকে রক্ষা করতে চায় অন্যের শিল্পের আক্রমণের হাত থেকে। তাই প্রতি রাষ্ট্রই শুল্কপ্রাচীরে নিজ নিজ দেশ রক্ষা করে। ফলে সব প্রকার ক্রয় বাণিজ্য বাধা পায়। ফলে ক্রমে আন্তর্জাতিক শুল্কদ্বন্দ্ব রূপে দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশের ঘরের মধ্যেও পুঁজিবাদ মুনাফা জমিয়ে ক্রমেই স্ফীত হয়, অথচ বঞ্চিত মজুর দুর্দশাপন্ন থাকে। এতে দেশের ভেতরেও দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বাড়ে, শ্রেণীসংগ্রাম দেখা যায়। ফলে চিরন্তন দ্বন্দ্ব আবার দেখা যায়।

তৃতীয়ত, ক্রমেই নতুন যন্ত্র আবিষ্কারে মজুরদের বেকারের সংখ্যা বাড়ে, আর এই মজুরেরা যখন দেশে-বিদেশে সংখ্যায় বেশি তখন তারা বেকার হয়ে গেলে ক্রেতার সংখ্যাও কমে আসে। ফলে উন্নততর যন্ত্রে পণ্য বেশি উৎপন্ন হয়, কিন্তু পণ্য বিক্রি কম হয়। আর বিক্রি না হলে মুনাফা নেই—তাই পুঁজির মালিকরা তখন কল বন্ধ করে দেয়। এই ভাবে বেকার মজুর সংখ্যা বাড়ে, দেখা যায় আর্থিক সংকট।

এই কারণে উৎপাদন শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পেলেও মুনাফাতন্ত্রের চক্রান্তে সেই উৎপাদনের সার্থকতা সমাজ আজ ভোগ করতে পারছে না। তা হলে এই যুগের এই ঐশ্বর্য আয়ত্ব করতে নাকি প্রত্যেক মানুষের সপ্তাহে মাত্র চার ঘণ্টা পরিশ্রমই হয়তো যথেষ্ট। অবশ্য তাও ছিল ১৯৩০-৩৫ এর আমলের হিসাব। এর পরে যন্ত্র বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদের জন্য চলছে এখনও পর্যন্ত উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়ে একটা অরাজকতা। এর ফলে অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়েছে, যুদ্ধ বেধেছে। অন্যদিকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আয়ু শেষ হচ্ছে। ফলে পুঁজিতন্ত্রেরও দম ফুরিয়ে আসছে।

৩০৯.৪.১৬.৪ : সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

বিশেষ একধরনের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা বোঝাতে, যেমন সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়, তেমনি বিশেষ একটা মতাদর্শ বোঝাতেও আমরা এই শব্দটির ব্যবহার করি। ১৮২৮ সালে প্রথম ফরাসী ভাষায় 'সোস্যালিজম' বা সমাজতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের তত্ত্ব আলোচনায় এই মতাদর্শটি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল। সমাজতন্ত্র— শব্দটি চয়ন করে এই ধারণা ব্যাপকতা দেখা যায় ঊনবিংশ শতকে। কাল্পনিক সমাজবাদীরা যৌথ উৎপাদনের ভিত্তিতে ছোটো ছোটো সমাজতান্ত্রিক কলোনী গঠন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। সমগ্র সমাজ পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক কোনো কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচী তাদের ছিলনা।

সমাজতন্ত্র হল কম্যুনিষ্ট-সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের প্রথম পর্যায়। সমাজতন্ত্রের সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানা, একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান। উৎপাদনী শক্তির বিদ্যমান স্তরের নিরিখে সমাজের সকল সদস্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সর্বোচ্চ পরিপূরণই এখানে উৎপাদনের লক্ষ্য।

পুঁজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক উৎখাতের ফলশ্রুতি হিসেবেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে, সেজন্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির মান ও পুঁজিতন্ত্রের আওতায় অর্জিত শ্রমিকদের উৎপাদনী দক্ষতার স্তর কার্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে আরম্ভ-বিন্দু হিসেবে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের যাবতীয় দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রের উত্তরাধিকার বর্তায় এবং উৎপাদন আরো বিকশিত হয়। তথাপি উৎপাদনের এই স্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনে সমাজের সকলের চাহিদার পূর্ণ পরিপূরণে সমর্থ হয় না।

১৯১৭-তে বিশ্ববিপ্লবের পাদপীঠ মাত্র একটি দেশে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে রচিত হয়েছিল সমাজতন্ত্রী ধারণা। তখন মাত্র বারো কোটি মানুষের জীবনের নবরূপদানে অধিকার পেয়েছিল। এখানে যুগোশ্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মান গণরাষ্ট্র শুদ্ধ সমস্ত পূর্ব ইউরোপেই ৮টি রাষ্ট্রের সেই বিপ্লবী শক্তি-রাষ্ট্রশক্তি—তা সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্বময় কম-বেশি আজ সমাজতন্ত্র বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন —

"সমাজতন্ত্রী পৃথিবীর এই শক্তিবৃদ্ধি এই যুগের প্রধান সত্য। এই সত্যের দ্বারাই পৃথিবীর রূপ মৌলিক ভাবে প্রভাবিত হইতেছে কি হইতেছে না, তাহা অবশ্য তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু এই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবন যে আজ এই বৈপ্লবিক আদর্শে রূপান্তরিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি, আজ পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবি তথা উন্নতিকামী মানুষ সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে। বলাবাহুল্য সমাজের মঙ্গলের জন্য তারা এই তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণীত।

বৈপ্লবিক রূপান্তরের অর্থ সকলের রূপহীনতা বা কারো বৈশিষ্ট্যহীনতা নয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনাই সমাজতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ও চীনের সমাজতন্ত্রী দলের মত পার্থক্য প্রকাশ্যেই আলোচিত। বর্তমান পৃথিবীর মূলগতি সম্বন্ধে সকলেই একমত যে, বৈপ্লবিক শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তব জগৎ তমসাচ্ছন্ন থেকে ক্রমাগত সংস্কারের পথ বেছে নিচ্ছে।

নব নব রাষ্ট্রে বিপ্লবের প্রকাশ সশস্ত্র, নিরস্ত্র বা স্বল্পাধিক সশস্ত্র বা স্বল্পাধিক নিরস্ত্র প্রভৃতি নানা পদ্ধতিতে হতে পারে। বিপ্লব রূপায়ণেও নানা বৈশিষ্ট্যের, নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব সম্ভব। শুধু স্মরণীয় এই যে—

"সমাজতন্ত্রী সৌভ্রাতৃত্ব অপরিহার্য, সায়েন্টিফিক্ সোস্যালিজ্‌মের আদর্শ ও মূলনীতিগত ঐক্য অন্যান্য অর্থাৎ রাষ্ট্রে চাই শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতী মানুষের পূর্ণাধিপত্য; আর্থিক বিন্যাসে চাই উন্নততর উৎপাদন ও ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মালিকানা; শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবিদের সমাজবাদী দায়িত্ব পালন; মানবিক বোধের প্রসার।"

অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যে কোথাও ব্যাঘাত ঘটে অসমান অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য কিংবা পারিপার্শ্বিক কারণে।

১৯১৭ থেকে ১৯৬৩—এই ছেচল্লিশ বছর সোভিয়েততন্ত্রের বিকাশ হওয়াতে সমাজতন্ত্রের মূল অবয়বটি সম্পর্কে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় তখন, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলের তত্ত্বটি আর শুধুমাত্র আনুমানিকই থাকে না, তার যথার্থ প্রয়োগও দেখা যায়। চাষীরা কিংবা মজুরেরা উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকারী হবে। সেখানে কোনো মালিকপক্ষ থাকবে না।

সমাজতান্ত্রিক ধারণার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা নিম্নে সূত্রাকারে এভাবেই লিখতে পারি —

ক. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটি বিষয়গত নিয়ম। পুঁজিতন্ত্রের মূল অসংগতি, অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও আত্মসাৎ-এর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার অসংগতি এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার উৎস—শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব তথা পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটজাত অন্যান্য স্বকীয় অসংগতি এর স্রষ্টা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা সাম্প্রতিক ভাবদর্শগত সংগ্রামের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

খ. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের শ্রেণী— সংগ্রামের তুঙ্গাবস্থা। প্রলেতারিয় বিপ্লবের পর্যায়ে উত্তীর্ণ একটি শ্রেণী সংগ্রামই কেবল সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজের মৌলিক পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারে।

গ. সমাজতান্ত্রিক একই সঙ্গে একটি বিষয়গত প্রক্রিয়া এবং জনগণের সজ্ঞান ঐতিহাসিক কার্যকলাপের ফলশ্রুতি। এই বিপ্লবকে জনগণ তাদের বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শের অঙ্গীভূত করে এবং তারা মার্কসবাদী লেলিনবাদী পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়।

ঘ. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল পুরানো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস এবং নতুন ধরণের একটি রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র—প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

ঙ. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল সামাজিক সম্পর্ক প্রণালীর বিপর্যয়ের ইতিহাসে একটি গোটা যুগ, উৎপাদন উপায়ের সামাজিক মালিকানাভিত্তিক নতুন সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি যুগ মূলত, মানুষ ও তার সর্বোতমুখী বিকাশের যথাসম্ভব চাহিদা পূরণের লক্ষ্য মুখীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি যুগ।

চ. প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি নীতি ও তার চূড়ান্ত বিজয়ের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

পরিশেষে বলা যায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক সুস্থ সদস্য সেরা সামর্থ্য দিয়ে সচেতনভাবে সমাজের সুবিধার্থে কাজ করতে বাধ্য থাকে, সমাজ তার যোগ্যতা, পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেয়। এই সমাজতন্ত্রের ফলেই সমাজে বিকাশ উন্নতি ও প্রগতি অব্যাহত থাকবে।

৩০৯.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সংকট সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের ভাবনার পরিচয় দাও।

৩। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থানুসরণে 'সাম্রাজ্যবাদের সংকট' সম্পর্কে লেখকের অভিমতের মূল্যায়ণ করো।

৪। 'সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ'–'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে লেখকের এই মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করো।

৩০৯.৪.১৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। গোপাল হালদার — 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনী।

২। ঐ — 'বাঙ্‌লা' সংস্কৃতির রূপ', 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনী।

৩। ঐ — বাঙ্‌লা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি ঐ

৪। অমিয় ধর — 'গোপাল হালদার'

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রকাশক—রমাকান্ত চক্রবর্তী, শ্রাবণ-১৪১১

৫। নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত — 'সংস্কৃতির ধর্ম, ধর্ম ও সংস্কৃতি' পুস্তক বিপনী,
প্রকাশক — সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৪

৬। হায়াৎ মামুদ — 'সংস্কৃতি ও প্রসঙ্গান্তর'—'চেতনা'
প্রকাশক—শেখররঞ্জন রায়, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

৭। মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল — 'সংস্কৃতির কথা' 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি'
প্রকাশক—সুনীল বসু, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

৮। সম্পাদনা — শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায় 'মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব'
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ — জানুয়ারী ১৯৮৪

৯। মৃদুল দে — 'মানুষ সমাজ সভ্যতা', 'নবযুগ' এজেন্সি কল্যাণী সেপ্টেম্বর ২০০৭

১০। সম্পাদক — বিমান বসু 'মার্কসবাদী পথ', নভেম্বর ২০০৭
৩২ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ প্রকাশিত

১১। মানব মুখার্জী — 'মানবতার দুই শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ'—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
প্রকাশক — সলিল কুমার গাঙ্গুলী, অক্টোবর - ২০০১

১২। সম্পাদক — নারায়ণ চৌধুরী — 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি'
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
প্রকাশক — জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় — ফাল্গুন - ১৩৮৪

———